অমর ভারত গড়ুল যারা

গিরীন চক্রবর্তী

পূরবী পাব্‌লিশার্স
কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্তৃক
পূরবী পাবলিশার্স
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন
হইতে প্রকাশিত

প্রচ্ছদপট শিল্পী : নরেন মল্লিক

দাম—দেড় টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা
১৩৫৬

আচার্য ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের কথা

ভারতীয় সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "Studies in Indian Social Polity" পড়ে প্রধানতঃ তারই ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এই বইটি। অন্য যে সব বই-এর সাহায্য নিয়েছি তার সংখ্যা নগণ্য।

অতীতের ভারতে প্রচ্ছন্ন শ্রেণী-সংগ্রামের অব্যাহত রূপটি এতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। রাজারাজড়ার বংশাবলীর পরিচয় নেই কোথাও। আছে সমাজের ভেতরের ছবির উল্লেখ। হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এমনি ছত্রিশ জাতির লোকের সবাই যে ভারতের ইতিহাসের সৌধ রচনায় একটি একটি করে ইটের যোগাড় দিয়েছেন তাই হচ্ছে বইটির মূল প্রতিপাদ্য। অন্য দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের সমাজের তুলনাও দেওয়া হয়েছে। তাথেকে প্রমাণ হবে যে, যাকে ভারতের নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থা বলা হয়—তা পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত, হয়তো সামান্যই রকম ফের আছে কোন কোন দেশে।

আশা আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে আমাদের সমাজের অবস্থা বোঝা আরও সহজ হবে। তবে কতটা বোঝাতে পেরেছি—তার বিচারের ভার পাঠকের উপর।

সত্যিকার ইতিহাস কাকে বলে

আমাদের দেশের অতীত সম্বন্ধে অনেক মোটা মোটা ইতিহাস আছে। তোমরাও অনেকেই হয়তো তার সন্ধান জানো।

কিন্তু বেশীর ভাগ ইতিহাসেই তোমরা শুধু পাবে সন আর তারিখের হিসাব। কত খৃস্টাব্দে বা খৃস্ট-পূর্বাব্দে কে ভারতে রাজা হয়েছিলেন ও তাঁর কজন বংশধর, তিনি কোন কোন দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী উপাধি নিয়েছিলেন, তাঁর রাজত্বে দেশের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল এই সবেরই বিরাট ফিরিস্তি মুখস্ত করতে করতে তোমাদের হয়রান হতে হয়েছে। রাজা আর রাজধানীর কাহিনী বললেই ইতিহাসের সব কথা বলা হয় না।

আবার সেই রাজা আর রাজধানীর কথাও এক এক জন লেখক বলেন এক এক ভাবে। দুজনের লেখা একই দেশের ইতিহাসে প্রায়ই কোনও মিল পাবে না! যিনি হিন্দু ঐতিহাসিক, তিনি হয়তো বৌদ্ধযুগের সব কিছুকেই খারাপ বলে দিলেন। তার মধ্যে থেকে যেটুকু তাঁর হিন্দুত্বের কাজে আসে সেটুকু শুধু তিনি বললেন ভাল। যিনি খৃস্টান তিনি নিজেদের কাহিনী বড় করে দেখালেন। ইতিহাসের

পাতায় পাতায় জমে রয়েছে এমনি নানা জঞ্জাল। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস সেজন্যেই এত কঠিন।

ভারতের অতীতের ইতিহাস তেমন করে কোন বইয়ে লেখা নেই। তার আছে নানা নিদর্শন। তাই থেকে ইতিহাস গড়ে তুলতে হয়। অনেক আগে ছাপানোর যন্ত্রই ছিল না। কাগজ, কলম, ছাপার যন্ত্র এ সব পরের যুগের আবিষ্কার। আগে মানুষ তালপাতা বা ঐ রকমই কোনও পাতায় হাতে লিখত। তাকে বলে "পুঁথি"। এখনকার হাতের লেখার সঙ্গে সে যুগের লেখারও অনেক তফাৎ কিনা তাই ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনেকে মিলে সেই পুঁথির পাঠোদ্ধার করেন। কোন পুরানো পুঁথি থেকে হয়তো অতীত যুগের ইতিহাসের একটা নতুন ঘটনা জানা গেল। পণ্ডিতেরা তখন সেই ঘটনার সঙ্গে আমাদের জানা আরও সে যুগের পাঁচটা ঘটনার তুলনা করে এক নতুন তথ্য প্রচার করলেন।

পুঁথির যুগেরও আগে আমাদের দেশে লোক ছিল। তাদের ইতিহাস কি করে জানলাম? সেই গহন অতীতে প্রায় সব দেশেই রাজা পাহাড় বা অন্য কোথাও পাথরের গায়ে নানা বাণী খুদে দিতেন। তাকে বলে "শিলালিপি"। পাথরে লেখা বলে ওগুলো যুগযুগান্তর ধরে নষ্ট হয় না। পণ্ডিতদের হাতে তেমনি কোন শিলালিপি পড়লে তাঁরা তা থেকে ইতিহাসের নানা অতীত কাহিনী আবিষ্কার করতে পারেন।

আবার মানুষ এক এক যুগে এক এক ধরনের টাকা পয়সা বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। অস্ত্রশস্ত্রের ধরন ধারনও ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। পণ্ডিতেরা তাই অস্ত্রশস্ত্র দেখেও মানুষের ইতিহাসের ধারা বলতে পারেন। এসব ছাড়া, আর এক রকমেও মানুষের অতীত ইতিহাসের গবেষণা হয়। মানুষ যুগ যুগ ধরে তার সমাজ গড়ে তুলেছে। ভাষা, আচারব্যবহার, সমাজ কোনটাই একদিনে হয় নি। বহুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে তবেই আমাদের বর্তমান সমাজ গড়ে উঠেছে। আমাদের যেমন সভ্যতা ও সমাজ আছে পৃথিবীতে তেমনি আরও নানা দেশের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সভ্যতা ও সমাজ আছে। এর মধ্যে কেউ আমাদের চেয়েও এগিয়ে গেছে আবার অনেকে আমাদের চেয়ে হাজার হাজার বছর পিছিয়ে রয়েছে। এইসব ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমাজের তুলনা করে একরকম ভাবে অতীতের ইতিহাস লেখা হয়। এমনি ভাবে বহু পণ্ডিতের মিলিত গবেষণার ফলেই একটি দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা হয়।

নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইতিহাসও যেমন নতুন করে লেখা হয় তেমনি আবার ইতিহাস লেখার ভেতরেও তারতম্য আছে।

জার্মান পণ্ডিত কার্ল মার্ক্স ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স্ দুজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের

ভাণ্ডার উজার করে ঘেঁটে আবিষ্কার করেন যে চলতি ধরনের ইতিহাস লেখাটাই ভুল। শুধু রাজারা কি করলেন, কটি কুয়ো কাটলেন, স্কুল খুললেন কিংবা কটা যুদ্ধ জিতলেন, এ নিয়ে সত্যিকারের ইতিহাস হয় না।

তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর যুগ যুগান্তের ইতিহাস ঘেঁটে কয়েকটি প্রধান তথ্য বের করেন। প্রথমে তাঁরা দেখান যে মানুষ যখন "বানরঅবস্থা" ছেড়ে প্রথম মানুষে পরিণত হয়েছিল তখনকার সে সমাজে সবাই ছিল সমান সমান। আজকালকার মত তখন কেউ বড় কেউ ছোট ছিল না। কাজেই তখনকার সমাজে আজকের মত এত অত্যাচার অনাচারও ছিল না। তারপরে ধীরে ধীরে মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় বদলিয়েছে। তার ধনসম্পদ বেড়েছে, নতুন নতুন কত অস্ত্রশস্ত্র হয়েছে। যে সমাজ ছিল মাত্র কয়েক জনকে নিয়ে তারপরে সেই সমাজ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ বিদেশে। সমাজের সমস্ত ধনসম্পদ হল কয়েকজনের কুক্ষিগত। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ হয়েছিল নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। আগের মত সমান সমান ভাব আর ছিল না।

তাঁরা বললেন যে সমাজে যখন থেকে শ্রেণী বিভাগ হয়েছে তখন থেকেই বড়লোকের আর গরীবের মধ্যে ঝগড়া লেগেই রয়েছে। যাঁরা বড়লোক সমাজের সবকিছু ব্যবসা বাণিজ্যের উপায় তাঁদের হাতে থাকে, তাঁদেরই কথা মত দেশ শাসন

হয়। আর যারা নিঃস্ব, ধনীরা সব সময় তাদের শোষণ করে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। গরীব আর বড়লোকের এই বিবাদ আবহমান কাল থেকেই চলে এসেছে।

সামান্য সামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করেই সেই সব ঝগড়া বিবাদ প্রকাশ পেত। বেশির ভাগ ঝগড়া হত ধর্ম নিয়ে। রাজারাজড়া আর বড়লোকেরা ধর্মের নামে অনেক অত্যাচার করতেন। তখন গরীবরা আর কোন নতুন ধর্মের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইত। পৃথিবীর যত নতুন নতুন ধর্ম হয়েছিল সবগুলোতেই সেজন্যে আছে যে, মানুষ মাত্রেই সমান। কেউ যেন কাউকে ঘৃণা বা হিংসা না করে।

মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ ঐ সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের আন্দোলনই আদিম ও মধ্যযুগে নানা ভাবে ধর্মের সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেত। আন্দোলন হত ধর্ম নিয়ে কিন্তু তার মূল কারণ খোঁজ করলে দেখা যেত যে সমাজের ধন-সম্পত্তির উপর কে কর্তৃত্ব করবে তাই হচ্ছে প্রকৃত সমস্যা—অর্থাৎ কারা হবে সমাজের কর্তা। গরীব আর বড়লোকের এই সমস্ত সংঘর্ষের ইতিহাসই হচ্ছে মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস।

তাছাড়া ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ইংরেজ আমলেই পরাধীনতার শৃংখল আমরা পায়ে পড়েছি। তার আগে যত রাজা বাদশা দিল্লীর তখ্‌ত তাউসে বসেছিলেন তাঁরা সবাই হয়ে পড়েছিলেন ভারতীয়। কিন্তু ইংরাজরা আমাদের শাসক ছাড়া

আর কিছু নন। রবীন্দ্রনাথ কি বলতেন জানো ? তিনি বলতেন "ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের অস্বাভাবিক সম্পর্ক। এই কারণেই ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় রাজা-মহারাজার দান দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের কোনো ধনী ভারতেব কোনো অনুষ্ঠানে দানের মত দান করেছে শুনতে পাই নি। অথচ, ভারত নিঃস্ব, ইংলণ্ড ধনী।"

এই সব দেশের পণ্ডিতরা মিথ্যে করে প্রমাণ করতে চান যে ইওরোপের উত্তরদিক থেকে এক শ্বেতকায় জাতি ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীময় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাদেরই ভুল করে আর্য বলা হয়। সেই শ্বেতকায় আর্যরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শৌর্যে, বীর্যে ভারতের আদিম অধিবাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই ভারতে এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতে যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আছে, এঁরা বলেন, মানুষের গায়ের রং অনুসারে আর্যরা সেই বর্ণাশ্রম বিভাগ করেছিলেন। পরাজিত কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীরাই হল এদেশের শূদ্র।

এইসব নতুন নতুন তথ্য যখন প্রচারিত হচ্ছিল, ইওরোপে তখন শুরু হয়েছিল যন্ত্রযুগ। কলকারখানার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যও হয় বেশি। নিজেদের দেশে না কুলোনোর জন্য কারখানার মালিকরা তখন দেশ বিদেশে ব্যবসা করবার চেষ্টা করছিল। যে যে দেশ পারল দখল করে উপনিবেশ গড়ল। গ্রাম প্রধান দেশগুলোতে তখনো পুরোমাত্রায় সামন্তবাদী যুগ

চলছিল। তাদের মধ্যে কারখানার নামও কেউ শোনে নি। পাশ্চাত্যের যন্ত্রযুগের ধাক্কায় সে নিরিবিলি জীবন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা ঐ সব দেশ দখল করবার জন্য প্রচার করতে লাগলেন যে পিছিয়ে পড়া দেশ বলেই তাঁরা সে দেশগুলোকে সাহায্য করতে এসেছেন। এই ধরনের পরোপকারের মুখোশ পরেই সাম্রাজ্যবাদীরা পররাজ্য লুণ্ঠন করে সব সময়। তাদের তখন কাজ হয় সব বিষয়ে বিজিত দেশের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা বিজিত দেশের ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। নিজেদের মনোমত করে তাই তাঁরা এদেশের ইতিহাস লিখলেন।

ভারতেরও অনেক পুরাতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ইওরোপীদেরই মত পোষণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বেদের যুগে ভারতের বাইরে থেকে একদল সুন্দর শ্বেতকায় জাতি ভারতে এসেছিল। সুন্দর শ্বেতকায় আর্যদের সঙ্গে আদিম কৃষ্ণকায় অসভ্যদের সংগ্রামের ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই ভারতের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

তবে এই মতের বিরোধিতা করেন আবার অনেক পণ্ডিত। পৃথিবীর সবদেশের ইতিহাস ও দর্শন ঘেঁটে মার্ক্স প্রমাণ করেছেন যে সমাজের কোন একটি বিশিষ্ট শ্রেণী যখন সেই সমাজে প্রভুত্ব করে সে তখন নিজেদের স্বার্থ বজায়

রাখবার জন্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সব কিছুই কলুষিত করে। বিজ্ঞানকে নিজের স্বার্থের উপযুক্ত করে বাখ্যা করে সমাজের অন্য সব শ্রেণীর লোককে বিভ্রান্ত করে নিজেদের শোষণের সুযোগ বজায় রাখাই হয় তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এইজন্যেই আমাদের দেশের লোকেরাও অনেকে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বর্তমানে কি কি ভাবে ভারতের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে তা বেশ মজার। ডাঃ ভুপেন্দ্র নাথ দত্তের মতে বৈদিক আর্যরা শ্বেতকায় জাতি ছিলেন বলাই প্রথম ভুল। জার্মান অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ইওরোপে প্রথম সংস্কৃত থেকে 'আর্য' কথাটি আমদানী করেছিলেন। তিনি কিন্তু 'আর্য' শব্দটি দিয়ে কখনো জাতি বোঝাতে চান নি। স্পষ্ট করে তিনি বলেছিলেন যে, 'যাঁরা আর্য ভাষায় কথা বলেন তাঁরাই আর্য।' কিন্তু তা হলে কি হবে ইওরোপে সবাই আর্য শব্দটির মানে করেন 'শ্বেতকায় সভ্য জাতি।'

আর্য শব্দটি দিয়ে জাতি বোঝানোর ফলে ইওরোপের বিজেতা দেশগুলোর এক মস্তবড় সুবিধা হয়েছিল। তাঁরা জোর করে বলতে লাগলেন যে তাঁরাই 'আর্য' এবং সেই 'আর্যদেরই' একটি শাখা ভারতে এসেছিল। কাজেই ভারতের উচিৎ ইওরোপের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা।

দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে। ভারতের

ইতিহাস পড়বার সময় নিশ্চয়ই তোমরা পেয়েছ 'দ্রাবিড় জাতি' মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকত। সভ্যতাও ছিল তাদের অনেক উঁচু। এ ধারণাও ভুল।

পণ্ডিত এলমৃস্মিড্ট্ বলেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যে সব লোক জন্মেছে তারাই 'দ্রাবিড় ভাষী।' এদেরই ভুল করে 'দ্রাবিড় জাতি' বলা হয়। আসলে দ্রাবিড় হচ্ছে একটি ভাষা। তাঁর মতে "দ্রাবিড় নামে যে দক্ষিণ ভারতের একটি স্বতন্ত্র জাতির কথা বলা হয় তার অস্তিত্ব উত্তর ভারতেও আছে। উত্তরের সেই জাতি আর্যভাষায় কথা বলে আর দক্ষিণের লোকেরা দ্রাবিড় ভাষায়।"

ডাঃ দত্ত তাঁরই কথা মানেন। তিনি বলেন ঋগ্বেদেই আছে যে, উত্তর ভারতে যারা দেউলে হত তারা যেত পালিয়ে দক্ষিণ ভারতে। তাদের বলা হত 'পরিবৃদ্ধ'। এদের নিয়েই দক্ষিণ ভারতের সমাজ গড়ে উঠেছিল। এদেরই ভুল করে দ্রাবিড় জাতি বলা হত।

আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বহুকাল ইওরোপের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ঐসব ঐতিহাসিকদের গড়া ইতিহাসের এ সমস্ত ভুল বের করেছেন। তিনি বলেন যে প্রাচীনকালে ইওরোপেও ঠিক ভারতেরই মত সমাজ বিভাগ ছিল।

শূদ্রদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের আগের ধারণাও এখন

ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সিন্ধু অববাহিকায় আবিষ্কৃত মহেন-জো দড়ো সভ্যতার আলোচনা করলে, কিম্বা আধুনিক যুগে সোভিয়েট দেশে যে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া সম্পর্কে নানা গবেষণা হচ্ছে তা থেকে আমাদের অতীত ইতিহাসের আরও অনেক ভুল ভবিষ্যতে শুধরে যাবার কথা।

এ বইটিতে তোমরা পাবে কারা ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী; আর পাবে অতীতের ভারতে গরীব আর বড় লোকের মধ্যে কি ভাবে সংঘর্ষ হত তার ছবি। গরীবদের দাবিয়ে রাখবার জন্যে বড়লোকেরা হাজারো রকমের কারসাজি করতেন। কখনো তাঁরা গুরু, পুরোহিত আর শাস্ত্রের সাহায্যে গরীবদের জব্দ করতেন, আবার কখনো কঠোর অত্যাচার করতেন তাদের ওপর।

এসব কাহিনী আজ তোমাদের কাছে নতুন ঠেকতে পারে কিন্তু মনে রেখো যে, ভারতের মর্মবাণী জানতে চাইলে তোমরা এসব তথ্য বাদ দিতে পারবে না।

ভারতের সভ্যতার স্বরূপ

সে বহু বহু যুগ আগের কথা। দুশো চারশো বছর নয় একেবারে দুচার হাজার বছর আগের কাহিনী। ইওরোপে গ্রীক জাতি তখনো সভ্যতার মুখ দেখে নি, তেমনি আরও অনেক দেশই ছিল বর্বর যুগে। সেই কোন অতীতে সিন্ধু নদীর তীরে বাস করত এক সুসভ্য জাতি।

এখনকার করাচী শহর থেকে পাঞ্জাবের দিকে যেতে প্রায় দুশো মাইল উত্তরে মহেন-জো দড়ো বলে একটি নগরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারের কৃতিত্ব এক বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বৌদ্ধ যুগের কোন নিদর্শন খুঁজতে খুঁজতে তিনি ঐ জায়গায় গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ স্তূপের পাশে তিনি আরও নানা স্তূপ দেখতে পেয়ে ভাল করে অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধানের ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতের ইতিহাসের এক বিস্মৃত যুগ।

মহেন-জো দড়ো ছিল প্রাগৈতিহাসিক তাম্র ও প্রস্তর যুগের সমৃদ্ধিশালী নগর। পোড়ানো কিংবা রোদে ঝলসানো ইটের জমকালো ইমারত রয়েছে তার সাক্ষী। চওড়া বড় বড় বাঁধাই করা রাস্তা শহরের একদিক থেকে চলে গেছে

আর একদিকে। দুপাশে তার চলেছে নোংরা জল নিষ্কাশনের ঢাকা-নর্দমা। পথিক ও বাসিন্দাদের জলের অভাব নেই। সেখানে রয়েছে বহু কূয়ো ও পুষ্করিণী। এককালে হয়তো তার টলটলে জলের ধারে বসে কত লোক কত স্বপ্ন দেখেছেন। স্নানের ঘরেরই বা বন্দোবস্ত কি অপূর্ব! পান থেকে চূনটি খসবার উপায় নেই। সুন্দর সুন্দর পায়খানা স্নানের ঘর আর মন্দির রয়েছে ধনীদের বাড়ীতে। মন্দির যখন আছে পুরোহিত, না থাকলে মন্দিরে মন্দিরে উপাসনা করতেন কারা? রয়েছে খেলার ক্লাব! ধনীর দুলালরা অবসর বিনোদনের জন্য সেখানে জড়ো হয়ে হৈ হুল্লোড় করতেন। পাশেই দেখতে পাবে জল-কেলীর সব নিখুঁত আয়োজন। সাঁতার কাটার উপযুক্ত করে বানানো পুকুর। তাতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি খাটানো, আরামের যাতে সামান্য ব্যাঘাত না ঘটে।

আছেন শ্রেষ্ঠী, রাজা রাজড়ার চেয়েও যাঁদের খাতির বেশি, অভ্রংলিহ তাঁদের প্রাসাদ। বিলাস ব্যসনের পূর্ণ আয়োজন সেখানে। বণিক কুলের অস্তিত্বের পরিচয়ও না আছে তা নয়। বিরাট বিরাট গাঁটের উপর তাঁদের মুদ্রা চিহ্ন রয়েছে অঙ্কিত। পাথর, মাটি, তামার তৈরী সে সব বিলাস সামগ্রী। চন্নু দড়োতে পাওয়া গেছে তেমনি বিরাট এক খেলনার কারখানা।

সবই হত সেদেশে প্রচুর। প্রশস্ত গোলাভর্তি রয়েছে গম আর বার্লি। তাতে দুই কাজই চলত, খাওয়া আর ব্যবসা। চাষের জিনিস পত্তরেরও অভাব নেই। লাঙলও রয়েছে পাথরের। আজকের চোখ দিয়ে সে লাঙল দেখলে হতাশ হতে হবে। কিন্তু লাঙল যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সেই কোন অতীতে তাদের সভ্যতার মাপ করবে কে বল ?

ধ্বংসাবশেষ জুড়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নানা জীবজন্তুর মূর্তি বিশিষ্ট শিল মোহর। মাটির ভাঁড়ের গায়েই বা কত কারুকার্য। সে সব পালিশ করা মাটির বাসন দেখলে এখনো সকলে আশ্চর্য হবে যে, কেমন করে অত আগে এত ভাল বাসন বানাতে শিখেছিলেন তাঁরা। পাথরের বাসনেরও অভাব নেই।

তামা কিংবা ব্রঞ্জের কাপড় বুনবার মাকু, সুতো পাকাবার অন্যান্য যন্ত্রপাতিও সে যুগে ছিল। কাস্তে, করাত, ক্ষুরও পাওয়া গেছে তামার। তাছাড়া তামা ও হাড়ের ছুঁচও পড়ে আছে সেখানে। কাপড়ের টুকরোও ছিল।

প্রসাধনের পরিপাট্যেরও অভাব নেই। হাড়, হাতীর দাঁত কি শঙ্খের চিরুণিও ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। পাথর, তামা, সোনা, রূপো দিয়ে তৈরী কত রকমেরই না গহনা ব্যবহার করত সে যুগের লোক !

শিবলিঙ্গ ও শক্তির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে মহেন-জো দড়োতে। লাল মাটিতে খোদাই অনেক নারী মূর্তি

আছে সেখানে। লাল পাথর ও ছাই রংএর মানুষের মূর্তিও আছে। এসবের মধ্যে পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের এক নৃত্যকুশলা নটীর মূর্তি। সে সব ভাস্কর্যের কাজ এত ভাল যে পরের যুগের গ্রীক-জার্মানদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তার তুলনা চলে।

মানুষের কঙ্কাল পড়ে আছে অনেক। তার করোটি গুলোও ঠিক যেমনকার তেমনি আছে। তাই নিয়ে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অনেক আলোচনাও চলেছিল। কঙ্কাল যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি নানা কবরও খুঁজে বের করেছেন পণ্ডিতরা। ভিন্ন ভিন্ন আকারের পাথরের সের-বাটখারারও সন্ধান মিলেছে। সেগুলো বেশীর ভাগই দেখতে তিনকোণা। দেখে মনে হয় যে, প্রথমে ভেঙে নিয়ে তারপরে বোধহয় ঘষেমেজে ঠিক ঠিক ওজনের মত তৈরী করা হয়েছে। কতগুলো ছোট ছোট বাটখারা আবার শ্লেট পাথরের। সেগুলো দেখতে অনেকটা পিপের মত, বড়গুলো কোণের মত। দড়ি বেঁধে সহজে নাড়া-চাড়া করবার জন্যে তার মাথায় একটি করে ফুটোও আছে।

শিলমোহরগুলো ও অন্যান্য নানা জিনিসের গায় অনেক রকম লেখাও পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত সে সব লেখার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেন নি।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে বেড়ান অতীতের ইতিহাস। শত সহস্র বৎসর আগের সভ্যতার এত নিদর্শন একসঙ্গে পেয়ে তো তাঁরা আনন্দে আত্মহারা। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান ছিলেন তখন সার জন মার্শাল। নানা জিনিস নিয়ে

গবেষনা করে তিনি বলতে চান যে, মহেন-জো দড়োতে বেদের সভ্যতার চেয়েও উন্নত এক সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। তিনি আরও বলেন যে বেদের আর্যরা যেখানে বসবাস করত সেখানে তাদেরও আগে তাম্রযুগের অন্য লোক থাকত। তাঁর মতে সে সভ্যতা ছিল খ্রীস্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগের।

সার জন মার্শাল-এর মত অনেক বিদেশী ঐতিহাসিকই বলতে চান যে ভারতে বেদের যে সভ্যতার কথা পাওয়া যায় তা হচ্ছে বাইরে থেকে আমদানী। মহেন-জো দড়োর সভ্যতাকে তাঁরা বলেন বেদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখন, এই সভ্যতার সত্যি মালিক কারা তাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে বেদ ও সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা একই সময়ের। বৈদিক ও সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা দুই-ই ভারতীয় ও হিন্দুরাই এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।

নৃতত্ত্ববিদরা মানুষের করোটি বা মাথার খুলি দেখে তাদের 'জাতি' বলে দিতে পারেন। কারুর হয়তো লম্বা মাথা, সরু নাক, আবার কারুর গোল মাথা, চ্যাপ্টা নাক। এরা সব ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোক। নৃতত্ত্ববিদরা মহেন-জো দড়োর কঙ্কালদের করোটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁদের মত যে, বেশীর ভাগ ভারতীয়রা যে জাতি থেকে উদ্ভূত মহেন-জো দড়োর লোকরাও সেই জাতি থেকেই

জন্মেছে। তা থেকেই ডাঃ দত্ত এবং অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে কল্পিত দ্রাবিড় সভ্যতার কোনও সম্বন্ধ নেই।

এছাড়াও এই মতবাদের পক্ষে তিনি নানা নজীর দেখান। সার জন মার্শালই বলেছেন যে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা তাম্র যুগের। আবার বহু পণ্ডিতও বলেন যে বৈদিক সভ্যতা তাম্রযুগের। ঋগ্বেদে পাথরের অস্ত্রের উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের লোক কাঠ কিংবা পাথরের বাসনে জল খেত। এছাড়া তামার অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনকোসনেরও প্রচলন বৈদিক যুগে ছিল। এ থেকে প্রমাণ করা যায় যে, বেদের সভ্যতা আর সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা একই যুগের হওয়া অসম্ভব নয়। এর পরেই প্রশ্ন জাগে তাহলে বৈদিক সভ্যতা কতদিনের। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রথমে বলেছিলেন যে, খ্রীস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হচ্ছে বেদের সভ্যতা। আর জন মার্শালও সেই মতই পোষণ করেন। কিন্তু বহু পণ্ডিতই একথা মানেন না। ভিনটারনিৎস নামে একজন জার্মান পণ্ডিত বলেন পৃথিবীতে কারও সাধ্য নাই যে, জোর করে বলতে পারে বেদ ঠিক কবে—খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০, ২০০০ কিংবা ৩,০০০ বছরে রচিত হয়েছিল। বেদের যুগ যদি সত্যি সত্যি দেড় হাজার বছর খ্রীস্টপূর্ব না হয়ে ৩০০০ বছর হয় তাহলে তা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার একই সময়ের একথা বলতে আমাদের কোন বাধা থাকে না।

তখনকার শব সংকার প্রথা থেকেও উপরের ধারণাই মানতে হয় আমাদের। মহেন-জো দড়োর যুগে প্রচলিত শব সংকার সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সার জন মার্শাল-এর মতে তখনকার দিনে শব 'দাহ' প্রথাই প্রচলিত ছিল বেশি। কিন্তু তাছাড়াও মাটির ভাঁড়ের মধ্যে বহু মৃত দেহের ভগ্নাবশেষ মহেন-জো দড়োতে, সঞ্চিত রয়েছে। আবার মৃতদেহ কিছু পুড়িয়ে ফেলার পরে পশু পাখী দিয়ে খাওয়াবার প্রথাও তখন প্রচলিত ছিল। ছোট শিশুদের কবর দেওয়া হত।

এদিকে বেদে প্রধানতঃ দুরকমে মৃতদেহ সংকারের উল্লেখ আছে—'অনগ্নিদগ্ধ' ও 'অগ্নিদগ্ধ'। অনগ্নিদগ্ধ কথার অর্থ হচ্ছে আগুনে না পোড়ানো। ঋগ্বেদে মাটিতে কবর দেবার প্রথারও কথা আছে। আবার সবটা না পুড়িয়ে অর্দ্ধেক পোড়ানোর কথাও তাতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, সবার প্রথমে ছিল কবর দেবার নিয়ম। অর্দ্ধেক পোড়ানোর নিয়ম হয়েছিল তার পরে। ডাঃ দত্ত বলেন, ঋগ্বেদের একটি শুক্তে আছে 'হে অগ্নি ওঁকে সম্পূর্ণ পুড়িয়ো না, ব্যথাও দিও না তাঁকে, শরীর কি চামড়া ছিন্ন ভিন্ন না হয় যেন!' ঋগ্বেদে আরও দেখা যায় যে, মৃতের শরীর অনেক সময় গরুর চামড়ায় মুড়ে দেওয়া হত। এ থেকেও ডাঃ দত্ত অনুমান করেন যে, সে সব মৃতদেহ কখনোই সবটা পোড়ানো হত না।

আংশিক দাহ না হলে চামড়া দিয়ে মুড়ে দেবার কোন মানেই হয় না। বেদের যুগে বলা আছে যে, মৃতের দেহ পোড়ানো হলে তার ছাই একটি মাটির বাসনে জড়ো করে গর্ত খুঁড়ে পুতে রাখতে হবে। অর্দ্ধেক পোড়ানো মৃতদেহ মাটির বাসনে জমা করে রাখার সঙ্গে মহেন-জো দড়োর শব সৎকারের মিল দেখা যায়। কারণ মহেন-জো দড়োতে ঐ ধরনের মাটির ভাঁড়ে জমানো আধ-পোড়া হাড় অনেক পাওয়া গেছে।

আবার বৈদিক যুগেরও অনেক লোক সিন্ধু উপত্যকাতে বসবাস করত। এসব থেকে মনে হতে পারে যে মহেন-জো দড়োর সভ্যতা বেদ থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

হড়প্পায় সার জন মার্শাল মানুষের মৃতদেহের সঙ্গে পশুর হাড়ও দেখতে পেয়েছেন। ঋগ্বেদে আছে যে, মানুষ মরে গেলে তার শরীর জড়িয়ে রাখতে হবে গরুর চামড়ায়, আর পরলোকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে একটি ছাগল মেরে কবর দিতে হবে। ঋগ্বেদের বিধান অনুসারে বিচার করলে হড়প্পায় মানুষের হাড়ের সঙ্গে পশুর হাড় পাবার কারণ সহজেই বোঝা যেতে পারে।

মৃতের শরীর পশুপাখীকে দিয়ে খাইয়ে পরে সেই হাড়গুলো ভাঁড়ে করে তুলে রাখা হয়েছে মহেন-জো দড়োতে। কিন্তু মৃতের দেহ এভাবে পশুপাখীদিয়ে খাওয়াবার কথা বেদেও আছে। অথর্ববেদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন যে, মানুষ মরে গেলে

হৃদয় চলে যায় অন্য কোথাও। হৃদয় না থাকলে তখন সে শরীর হয় পশুপাখীর খাদ্য। কুকুর খায় সে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে, পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে। সিন্ধু উপত্যকার এপ্রথার সঙ্গে বেদের প্রথার হুবহু মিল দেখা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকেও দুটি সভ্যতার বহু সাদৃশ্য নজরে পড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেখানে আবিষ্কৃত বাসনকোসনএর উপরেই জোর দেন সবচেয়ে বেশি। সিন্ধু উপত্যকার বাসনের গায়ে মানুষের মূর্তি নেই। অথচ সুমের, এলাম ও মিশরের বাসনের গায়ে বহু মানুষের ছবি খোদাই দেখতে পাওয়া গেছে। অন্য সমস্ত সভ্য দেশের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার সে বিষয়ে বিরাট পার্থক্য আছে। ধাতব দ্রব্যের মধ্যে সেখানে তামা পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি। সেজন্যই তাকে তাম্রযুগের সভ্যতা বলা হয়। বেদের যুগেও তামার প্রচলনের কথা আগেই বলা হয়েছে। আজ পর্যন্ত পূজা অর্চনায় তামার বাসন না হলে চলে না বলে মনে করা অন্যায় নয় যে, মহেন-জো দড়োর লোক ও বেদের যুগের লোকেরা ছিলেন একই বংশের।

কারিকরদের যন্ত্রপাতির মধ্যে করাতই সবচেয়ে দরকারী। দেখতে সেগুলো অর্দ্ধচন্দ্রের মত আর সেগুলোতে আছে দাঁত। ঐ যুগের অন্য প্রাচীন দেশের কোথাও দাঁত লাগানো করাত দেখা যায় নি। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা যে অন্য দেশথেকে পৃথক ছিল তারই সাক্ষী এগুলো।

কোন কোন মরার হাড় জমা করা মাটির ভাঁড়ের গায়ে

উপকথার কাহিনী ছবির মধ্যে গিয়ে এঁকে দেওয়া আছে। মৃত্যুর পর তার কাপলে কি আছে, কি ভাবে সে স্বর্গে যাবে তারই নানা ছবি। সেই সব বর্ণনার সঙ্গেও বেদের উপাখ্যানের অনেক মিল পাওয়া যায়।

এসব ছাড়াও হড়প্পাতে শিশুদের হাড় পাওয়া গেছে মাটির হাঁড়িতে। আজও হিন্দুদের মধ্যে শিশুদের কবর দেবার প্রথা প্রচলিত আছে তা বোধ হয় তোমরা জানো!

মহেন-জো দড়ো আর হড়প্পার স্তূপের নানা স্তর আছে। বিভিন্ন স্তরের জিনিসের মধ্যে সামান্য সামান্য পার্থক্যও নজরে পড়ে। এক একটি স্তর দেখলে মনে হবে যেন সেগুলো ভিন্ন যুগের আলাদা সভ্যতার নিদর্শন। যিনি সেই স্তূপ খুঁড়েছিলেন তাঁর মতে কিন্তু স্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার নিদর্শন নয়। একটানা একই সভ্যতার সূত্রে চলে এসেছিল সে দেশে। তবে রাজ্য পরিবর্তন, দেশবিদেশের প্রভাব নানা কারণে তাদের সামান্য সামান্য অদল বদল হওয়া বিচিত্র নয়।

এরপরে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে ভারতে তাহলে সংস্কৃত ভাষা এল কি করে? এখনকার চলতি মত হচ্ছে যে সংস্কৃত হিন্দী-ইওরোপীয় ভাষারই একটি অংশ।

স্বামী শঙ্করানন্দ বলেন যে, সংস্কৃত ভাষা সিন্ধু-উপত্যকার ভাষা থেকেই এসেছে। তাঁর মতে 'সংস্কৃত' কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন কিছু বদলে নতুন করা। বেদের অপ্রচলিত ভাষারই অদল বদল

করে যে ভাষা তৈরী হয়েছে তাকেই আমরা সংস্কৃত বলি। বেদের ভাষাকে ভারতে বলা হয় "আর্ষ" অর্থাৎ ঋষিদের! এর জন্য ছিল ভিন্ন ধরনের ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যকরণ দিয়ে বেদের ভাষার পাঠোদ্ধার করা যায় না। 'আর্ষ' ও 'আর্য' কথা দুটির মূলও একই। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা পাওয়া যায় নি যা থেকে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলা যেতে পারে। ইওরোপীয় ভাষার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বলেই যে ইওরোপ থেকে সে ভাষা এদেশে এসেছে তা বলা যায় না। অবশ্য এ বিষয়ে এখনো সব পণ্ডিতেরা একমত নন।

ভাষার পরে আসে ধর্ম। সার জন মার্শাল বলেছেন যে, মহেন-জো দড়োতে যে সব ধর্ম সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া গেছে তার অনেক কিছুই বেদের যুগেও প্রচলিত ছিল। তাঁর বিবরণ থেকে মনে হয় যে আধুনিক হিন্দুদের যে সব বিশেষত্ব আছে তার সব কটিই সিন্ধু উপত্যকাতেও প্রচলিত ছিল। বেদের দেবতা সূর্য, অগ্নি, সোম ও অদিতি এ সবেরই অস্তিত্ব মহেন-জো দড়োতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

উপরের এত সব নজীর থেকে মনে হয় যে, ভারতের সভ্যতার উৎস ভারতেই। সমস্যা হচ্ছে যে, এই সভ্যতা গড়ে তুলেছে কারা। এবিষয়ে ব্রাহ্মণরা বলতে চান যে ভারতের সভ্যতা তাঁরাই গড়েছেন, তাঁদেরই প্রভাবে ভারতের সংস্কৃতি এত মহীয়ান হয়ে উঠেছে!

ডাঃ দত্ত বলেছেন যে, ব্রাহ্মণদের সে দাবী ঠিক নয়। ব্রাহ্মণ ছাড়াও সে যুগে অনেক নামকরা লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে ঐলুষকবস, উসিজ, কক্ষিবন্ত ও বৎস ঋষিদের দাসীপুত্র বলা হয়েছে। বেদের আর এক ঋষি হচ্ছেন পৃষধ। মৎস ও অন্যান্য পুরাণে তাঁকে শূদ্র বলা হয়েছে। প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা ছিল ক্ষত্রিয়দেরই একচেটিয়া।

পরের যুগে বৌদ্ধ ও জৈনরা নতুন ধর্ম স্থাপন করেছিলেন ভারতে। তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। ছন্দোগ্য উপনিষদে শূদ্র রাজা জনশ্রুতি ও গোত্রহীন জাবালার ছেলে সত্যকামের নাম দেখতে পাবে।

এর পরে ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ আরম্ভ হয়। প্রথমে এলেন আলেকজাণ্ডার। তাঁর আক্রমণের সম্মুখে সমাজের উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয় রাজারা কেউ বুক উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন না। সেই সময় পূর্বাঞ্চলের শূদ্রবংশীয় নন্দ রাজারাই ভারত থেকে যবনদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলায় গোপালদেব থেকে আরম্ভ করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত শূদ্রেরাই স্বাধীনতা ও দেশের গৌরবের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। বৃটিশ আমলের পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহও ছিলেন শূদ্র!

ভারতের সংস্কৃতিতে ও ইতিহাসে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য শ্রেণীর লোকেরও দাম কম নয় তাহলে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তবু কেন শুধু শোনা যায় যে ব্রাহ্মণরাই সংস্কৃতির পতাকাধারী? এর মূলে রয়েছে শ্রেণীস্বার্থ। সমাজের বড়লোকরা ব্রাহ্মণদের

সহযোগিতায় গরীবদের দাবী চেপে নিজেদের কৃতিত্বের বড়াই করেন সব সময়।

গরীব যারা, যারা জিনিসপত্তর বানিয়েছে, তাই নিয়ে কেনাবেচা করে দেশের ধন সম্পদ বাড়িয়েছে, যারা নিজেরা বাটালী ধরে করেছে ভাস্কর্য, তুলি দিয়ে এঁকেছে অজন্তার গুহার মত ছবি, কাঠ কেটে জাহাজ বানিয়ে সেই জাহাজে চড়ে দেশ বিদেশ জয়ের অংশ নিয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাদের দান নেই বললে ভুল করা হবে।

আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগে মহাকবি অশ্বঘোষ বলে গেছেন "এখন আর মনুর মতে সমাজ চলে না, বৌদ্ধ শূদ্রও ব্রাহ্মণেরই মত শিক্ষিত হচ্ছে।" ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারও দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে ব্রাহ্মণদেরই মূর্খ বলা আছে। ডাঃ দত্ত আর একজন শূদ্র মহাপণ্ডিতের নাম করেছেন। তিনি হচ্ছেন রাজা ধর্মপালের কায়স্থ জ্যেষ্ঠ্য টক্কাদাস। তিনিই শেষ বিক্রমশীলার সংঘারামের প্রধান অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

এক কথায় বলতে গেলে ভারতের সর্বশ্রেণী, বর্ণ ও সব ধর্মের লোক নিয়েই ভারতের সংস্কৃতি নানা ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে। এ সভ্যতা কারুরই একচেটিয়া নয়।

ভারতের সভ্যতার সাক্ষী

সেই অতীতের সাক্ষী রয়েছে কতগুলো পুরানো ধর্ম গ্রন্থ। এগুলোই হল বেদ। তাইতো হিন্দুদের মধ্যের সবাই বেদকে এত শ্রদ্ধা করে। প্রধানত চারটি অংশে বেদ বিভক্ত—ঋক, সাম, যজু, আর অথর্ব। তাদের মধ্যে ঋগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রত্যেক বেদই আবার ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ আর উপনিষদে। সংহিতা অংশটি কাব্য ছন্দে লেখা। বেদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস হল এই সংহিতা। সমস্ত অংশটিই স্তোত্র আর প্রার্থনায় ভর্তি।

ব্রাহ্মণ আর উপনিষদ গদ্যে লেখা। ধর্ম আর সংহিতার ব্যাখ্যা আছে এতে। এর ভেতরও আবার কতগুলো ভাগ রয়েছে। তাদের বলা হয় আরণ্যক। গহন অরণ্যে বসে বোধহয় এসব নিয়ে ধ্যান করতে হত তাই আরণ্যক নাম হয়েছে। উপনিষদে রয়েছে দর্শনের আলোচনা! উপনিষদের ভিত্তিতেই বেদান্ত দর্শন রচিত হয়েছিল।

ঋগ্বেদের উপর ভিত্তি করে পরের যুগের ভারতের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বলে অনেকে মনে করেন। এতে সবশুদ্ধ ১০২৮টি স্তোত্র আছে। তার প্রায় সবই পূর্বপুরুষ বা ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য করে রচিত। এতে যে সব নদ নদী ও দেশের উল্লেখ আছে তা থেকে পণ্ডিতরা

মনে করেন যে এখনকার আফগানিস্থান, পাঞ্জাব, আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল তাদের আদিম বাসস্থান। ঋগ্বেদের যুগে সমাজে ছিল পিতৃশাসন। সমাজ ছিল নানা কুলে বিভক্ত। একই বংশের কতগুলি পরিবার মিলে গঠিত হত এই সব কুল। কৃষি ও পশু পালনই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। তাছাড়া, চামড়ার কাজ, কাপড় বোনা আরও নানা কারিকরীও তাঁরা জানতেন।

সমাজে জাতিভেদ প্রথা তেমন প্রচলিত ছিল না। তবে ব্রাহ্মণরা অন্যের চেয়ে উঁচু আসন দাবী করতেন সমাজে। রাজা বলতে এখন যা বোঝায় তখনকার রাজা তা ছিলেন না। রাজা বলতে তখন সেই সব কুলের নিজেদের লোকের নির্বাচিত নেতাকেই বোঝাতো। তিনি যেমন সবাইকে রক্ষা করতেন আবার তেমনি বিচারও করতেন। সাম বেদের মধ্যে বিশেষ কোনও নতুনত্ব নেই। ঋগ্বেদেরই সমস্ত স্তোত্র সাজিয়ে গুছিয়ে সামবেদ তৈরী হয়েছে।

সে দিক থেকে যজুর্বেদের মূল্য বেশী। ঋগ্বেদের যুগ থেকে যজুর্বেদে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। সিন্ধু উপত্যকা থেকে উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্র পর্যন্ত দেশের বর্ণনা আছে এতে। নানা যানবাহনের প্রচলন হয়েছিল তখন। সমাজে তখন পুরোহিতদের প্রয়োজন হত সব সময়। এমনি করেই ক্রমে পরের যুগের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের আধিপত্য গড়ে উঠেছিল দেশে। যজুর্বেদেই প্রথম জাতি-

ভেদের উল্লেখ আছে। তাছাড়া অসবর্ণ বিয়ের ফলে বর্ণ সংকরের উদ্ভবের কথাও আছে তাতে।

অথর্ববেদ আগের সব কটি থেকে পৃথক ধরনের। এতে যাগ-যজ্ঞ বা পূজা অর্চনার কথা তেমন নেই। আগের যুগের সাধারণ লোক কি ভাবতো তাই ভিত্তি করে এটি রচিত হয়েছিল।

বেদের পরে আসে 'পুরাণের' কথা। পুরাণ হচ্ছে সংখ্যায় ১৮টি। এতে উপকথা, দর্শন, ইতিহাস, ও ধর্মশাস্ত্র সব কিছুরই আলোচনা আছে। অথর্ব বেদেও পুরাণের নাম পাওয়া যায়। তাথেকে পণ্ডিতরা মনে করেন যে পুরাণ অনেক প্রাচীন কালেই রচিত হয়েছিল। বেশির ভাগ পণ্ডিতেরই মতে গুপ্ত যুগে যখন সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা নতুন করে আরম্ভ হয়েছিল তখন আরও অনেক নতুন পুরাণ রচিত হয়েছিল। এ যুগে যেসব পুরাণ রচিত হয় তার মধ্যে বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হচ্ছে প্রধান।

এসব বাদে 'স্মৃতি' শাস্ত্রও আছে অনেক। স্মৃতিতে প্রধানত ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শন শাস্ত্র আছে। এসব গ্রন্থে তখনকার যুগের সমাজের অবস্থা খুব ভাল করে বর্ণনা করা আছে। এদের উপর ভিত্তি করেই পরের যুগে নানা 'ধর্মশাস্ত্র' রচিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যারা ভারতের ইতিহাস রচেছিল এবার দেখবে তাদের নিজেদের মধ্যে কেমন

সম্বন্ধ ছিল! অতীতের কথা বললেই মনে পড়ে স্বর্ণ যুগের ছবি। সমাজের যেন সব শ্রেণী একে অন্যকে ভাই ভাই মনে করে সুখে কালাতিপাত করত। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে কিন্তু নজরে পড়বে অন্য কথা!

বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজ আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ পেরিয়ে এসেছিল। আদিম সাম্যতন্ত্রে রাজা ছিল না! কিন্তু বেদে রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় অনেক। তাঁদের নিজ নিজ সৈন্যদলও ছিল। রাজা ও পুরোহিত, এঁদের কে দেশ শাসন করবেন আর কে যে পূজা অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তারও ভাগ হয়েছিল তখনি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মানুষের মনে জন্মেছিল সেই যুগেই।

ভারতের সমাজ ব্যবস্থা আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে ভিন্ন ধরনের হলেও কিন্তু ভারতের শাসন ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। সমাজের সবাই মিলে জোড়াতালি দিয়েই শাসন কাজ চালানো হত। কাজেই তখনো সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তেমন করে রেষারেষি দেখা দেয় নি। খাওয়া ছোঁওয়া নিয়েও তেমন কঠিন বিধি নিষেধ সৃষ্টি হয় নি। এখন তোমাদের কেউ চাঁড়ালের বাড়ী খেলে আর রক্ষে থাকবে না হয়তো, কিন্তু তখন তা হত না!

বেদে একজন ব্রাহ্মণের কথা আছে। তাঁর নাম বামদেব। ক্ষিদের জ্বালায় তিনি চণ্ডালের বাড়ীতে কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন। তাতেও তাঁর জাত যায় নি।

একজন ঋষি বলতেন 'আমি হলাম কথক, আমার বাবা ছিলেন বৈদ্য আর মা ভাঙতেন পাথর। নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহের আগ্রহে আমরা সকলে এক সঙ্গে বসবাস করি, ইন্দ্রকে তুষ্ট করবার জন্যে সোম রসে যজ্ঞ করি!' তাহলেই দেখতে পাচ্ছ যে তখন কারুর কাজের কোনও ঠিক ছিল না। যে কোন লোক যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। কেউ কিছু বলত না তাতে।

ক্রমে ঋগ্বেদের সমাজে একটি ধনী সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়েছিল। তার নাম 'মঘবা'। গরীবদের মধ্যে প্রধান ছিল শূদ্ররা। তাদের মধ্যে একদল ছিল দাস ও অন্যদল স্বাধীন। স্বাধীন শূদ্র ও বৈশ্যরা মিলে কৃষি আর অন্য নানা কাজ করত।

বৈশ্যরা শূদ্রদের সঙ্গে কাজ করে বোধ হয় পারত না। তাই তারা শূদ্র আর ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নিজেদের দলের সবাইকে নিয়ে এক "সংঘ" তৈরী করেছিল। এই রকম এক এক দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সংঘ তৈরী হত তাকে সংস্কৃতে বলত "শ্রেণী" আর ইংরাজীতে বলে 'গিল্ড্' (Guild)।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটি বিভাগ ছিল তখনকার সমাজে। মনে করো না যে, তারা সবাই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকত। বড়রা চাইতো অন্যদের দাবিয়ে রেখে নিজেরা বড় হতে। এই ভাবেই প্রথমে এক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। তৈত্তিরিয় সংহিতায় আছে যে রাজন্য

শ্রেণী নিজেদের বলতো অন্য সব শ্রেণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাজন্য শ্রেণীই হল ক্ষত্রিয়রা।

এই যুগের আবার অনেক গ্রন্থে দেখা যায় যে, সমাজে ব্রাহ্মণই নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করছে। সমাজে কে বড় তাই নিয়ে বহুদিন ধরে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই রেষারেষি চলেছিল। অথর্ব বেদ, এবং মৈত্রায়ণী সংহিতায় এই সমস্ত সংঘর্ষের বর্ণনা আছে। শুধু যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই সংঘর্ষ হত তা নয়। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ধনী দরিদ্রের মধ্যেও সংঘর্ষ লেগেই থাকত। ত্রৈত্তিরীয় সংহিতা ও কথক সংহিতায় এসব বর্ণনা পাওয়া যায়।

অবশেষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল এক বিরাট সংঘর্ষ। যারা রামায়ণ পড়েছো তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে মহাব্রাহ্মণ পরশুরাম একুশবার পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করেছিলেন।

বাল্মিকী-রামায়ণে তোমরা পাবে ব্রাহ্মণদের কথা। সেখানে ক্ষত্রিয়দের ছোট করে দেখানো হয়েছে। আবার যখন জৈনদের লেখা বই 'হরিবংশ,' 'সুভৌম চরিত' তোমরা কেউ পড়বে তাতে দেখবে এই সংগ্রামেরই কথা আছে ক্ষত্রিয়-দের দিক থেকে। এসময়ে ক্ষত্রিয় সম্রাট পুরূরবা ও নহুষ ব্রাহ্মণদের উপর নানা অত্যাচার করতেন। সুবিধে পেলেই ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের গরুর পাল কেড়ে নিতেন, তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের বন্দী করে রাখতেন। ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারের

হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ব্রাহ্মণরা আকুল হয়ে 'রুদ্র'দেবের শরণাপন্ন হতেন।

'রুদ্র' ছিলেন ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বড় দেবতা। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। রুদ্রের আরাধনার জন্য তখন নানা স্তোত্র রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'ব্রহ্মজায়া' 'ব্রহ্মগাভী' ও 'শতরুদ্রীয়' স্তোত্র। জৈনগ্রন্থে আছে যে ক্ষত্রিয় হৈহৈয়রা তাদের নেতা কার্তবীর্যার্জুনের অধীনে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি নষ্ট করেছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের এই যুদ্ধ প্রায় একশো বছর ধরে চলেছিল। অবশেষে ক্ষত্রিয়দের কাছে ব্রাহ্মণরা হেরে যান। এযুদ্ধে হেরে গিয়ে ব্রাহ্মণদের দুর্দশার এক শেষ হয়েছিল। ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আগে ব্রাহ্মণরা অনেক সময় দেশ শাসনও করতেন। কিন্তু এখন থেকে তাঁদের শুধু পূজা অর্চনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হল। তবে এতদিনের সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণরাও ক্ষত্রিয়দের কাছে থেকে অনেক সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন। তাঁদের সম্মান দেখাবার দাবী ও যজমানদের কাছথেকে দক্ষিণার অধিকার সবাই মেনে নিল। ব্রাহ্মণহত্যা পাপ বলে গণ্য হল। রাজা তাদের ফাঁসী দিতে পারতেন না।

এছাড়াও রামায়ণ সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। আমরা সবাই জানি যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাল্মিকী। কিন্তু তিনি প্রমাণ

করেছেন যে, যে সমস্ত কাহিনী নিয়ে রামায়ণ রচিত তা বাল্মিকীরও আগে এদেশের লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতে যে রামায়ণ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে রাবণের কাহিনী সম্ভবত ছিল না। রাবণের কাহিনী প্রচলিত ছিল দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যের বহু গাথায় রাবণ নামে একজন বীরের কাহিনী পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ "লঙ্কেশ্বর সূত্রে" আছে যে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে নানা তর্ক করে পরাজিত হয়ে অবশেষে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জৈন রামায়ণেও রাবণের বীরত্বের বহু কাহিনী আছে। সে সব বইতেই রাবণকে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়বিজয়ী মহাপুরুষ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যখন ভীষণ যুদ্ধ চলছিল তখন ব্রাহ্মণ কবিরা উত্তর ভারতের রামগীতি আর দক্ষিণ ভারতের রাবণ গীতিকে একত্র করে নিজেদের সুবিধা মত এই রচনা করেছিলেন। বাল্মিকী পরে সেই গাথা অনুসরণ করেই রামায়ণ লিখেছিলেন। মজার কথা এই যে, বাল্মিকীর আগের রামায়ণের ঘটনা কিছু কিছু বাংলা রামায়ণে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভাল করে জানতে চাইলে বড় হয়ে তোমরা দীনেশ চন্দ্র সেনের The Bengali Ramayana নামে ইংরাজী বইটি পড়ো। তাতে সব পাবে। জপতপ আর যোগ আরাধনা সবই ব্রাহ্মণদের একচেটে ব্যাপার দেখে তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ভেবেছো কেন এমন হল। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউইবা কেন বিয়েতে মন্ত্র পড়তে পারে না? বছরের পর বছর ক্ষত্রিয়দের

সঙ্গে যুদ্ধ করে নানা দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে তবেই পূজার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর' ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্বটা বংশগত অধিকার হয়ে পড়েছে।

ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের ভেতরে ভীষণ শ্রেণী সংঘর্ষের পরে এল বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধ রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশের, তখন ক্ষত্রিয়রা চাইলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ বলে নিজেদের জাহির করতে। গৌতম বুদ্ধও একথাই বলেছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য পড়লে দেখবে যে, তাঁদের মতে সমাজে ক্ষত্রিয়দের পরে হচ্ছে ব্রাহ্মণদের আসন। বৌদ্ধ রাজা অরিন্দম পুরোহিতের ছেলেদের বলতেন 'হীনজাত'! আবার কোশলের রাজা ব্রাহ্মণদের মুখদর্শন করবেন না বলে ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় সামনে পর্দা টাঙিয়ে নিতেন।

বৌদ্ধদের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃত বইএ 'অনার্য' বলে কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে প্রথম অনার্য শব্দের কথা ওঠে। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য বলতে তখন কোনও বিশেষ জাতি বোঝাতো না। যারা ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে জীবন যাপন করত তাঁদেরই বলা হত আর্য। যারা বেদের বিধান মানত না কিংবা অন্য ধর্মে বিশ্বাস করত তাদের বলা হত 'অনার্য।' পণ্ডিত যাস্ক "নিরুক্ত ও নির্ঘণ্ট" নামে বইতে প্রথম 'অনার্য' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তখন মগধদেশের নাম ছিল কিকাত

প্রদেশ। মগধে ঐ সময়েই গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫৬৩ বছর আগে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। ছোট বেলায় তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁর পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। চারিদিকে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার অনাচার, আর তাদের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। কি করে মানুষের দুঃখ দূর করতে পারবেন তারই পন্থা আবিষ্কার করার জন্য রাজ্য সুখ ছেড়ে সামান্য সন্ন্যাসীর মত দেশ বিদেশে বেড়িয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি। বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে তবেই তিনি সত্যিকারের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তারপর তিনি নতুন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। সব মানুষই সমান, কেউ উঁচুনীচু নয় এই ছিল তাঁর শিক্ষার অন্যতম প্রধান নীতি। তিনি বলতেন যে, উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করলেই কেউ আপনাআপনি মোক্ষলাভ করতে পারে না। যতদিন না প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, ততদিন মানুষের কোনও উন্নতি হতে পারে না। যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রাদি পাঠ করলেই হয় না, সদাচার, জীবে দয়া, সত্য চিন্তা, এসব না হলে মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে না।

ব্রাহ্মণদের সমাজ ব্যবস্থার মূলে ছিল অসাম্য। নানা শ্রেণীতে বিভক্ত বলে সব সময় তাঁদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ লেগেই ছিল। আর বৌদ্ধরা চাইল সাম্য। বুদ্ধদেব চাইলেন সাধারণ লোকের মুক্তি। কাজেই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রথম থেকেই

তাঁর ধর্মমতের সংঘর্ষ হয়েছিল। গরীবরা বৌদ্ধদের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। কাজেই ব্রাহ্মণদের সমাজ ছেড়ে দিয়ে তারা দলে দলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তখন কোন হিন্দু যাতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ না করতে পারে সেজন্য ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে বেড়াতেন। তাঁরা বৌদ্ধদের অসভ্য, অনার্য বলে গালাগালি করতেন। কাজেই দেখতে পাচ্ছ বৌদ্ধ ধর্ম যারা গ্রহণ করেছিলেন যাস্ক তাঁদেরই বলেছিলেন অনার্য। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদেরও ভুল ধারণা আছে যে, আর্য ও অনার্য দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির লোক। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এরা একই জাতির দুরকম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় মাত্র।

সমাজের নিরীহ গরীবদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার দিনদিন বাড়ছিল। গৌতম বুদ্ধ ধর্মের নামে গরীবদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রাচীন বৈদিক প্রভাবযুক্ত গোঁড়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বৌদ্ধদের নতুন বিপ্লবী সমাজ ব্যবস্থার সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধ যখন নিজের ধর্মমত প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন তখন পূর্ব ভারতে আর একজন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম মহাবীর। তিনি বৈশালীর কাছে কুণ্ডগ্রামে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গৃহত্যাগী হয়ে মহাবীর নানা জ্ঞান অর্জন করে পরে এক নতুন ধর্মপ্রচার করেন। সেই ধর্মমতের নাম হল জৈন ধর্ম। এঁরাও

ব্রাহ্মণদের বেদে বিশ্বাস করতেন না। জাতিভেদ প্রথার সব সময় বিরুদ্ধতা করে এসেছেন তাঁরা।

একবার যখন ক্ষত্রিয়রা বৈদিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁদের দেখাদেখি বৈশ্য ও শূদ্ররাও সুযোগ বুঝলেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন। কে চায় নীরবে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার মাথাপেতে সহ্য করতে তাই বল! যখনকার কথা হচ্ছে সে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। তখন নতুন ধর্ম প্রচার এত সহজ ছিল না। কোন রাজার সাহায্য না পেলে নতুন ধর্মমত প্রচারের তেমন ক্ষমতা ছিল না কারুর। কোন কোন রাজা প্রথম থেকেই বৌদ্ধ কিংবা জৈন ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। শৈশুনাগ বংশের বিম্বিসার ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর ছেলে অজাতশত্রু ছিলেন আবার তেমনি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। অজাতশত্রুর রাজত্বে বৌদ্ধদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুঃসহ।

রাজধর্ম হলে নতুন ধর্ম প্রচারে সুবিধা হয় সত্যি কথা। কিন্তু রাজা যত ভালই হন না কেন তিনি ঠিক গরীবদেরই একজন হতে পারেন না কখনো। তাই বৌদ্ধ কি জৈন ধর্ম রাজধর্ম হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে অনেক দোষ ঢুকেছিল। হিন্দু ধর্মের মত এঁদের মধ্যেও নানা ভড়ং দেখা দিয়েছিল পরের যুগে।

শৈশুনাগ বংশ বহুদিন রাজত্ব করার পরে ইতিহাসে দেখা যায় যে 'নন্দবংশ' মগধ শাসন করেছিলেন।

নন্দবংশ জাতিতে ক্ষত্রিয় নয়। "পুরাণে" লেখা আছে যে, মহাপদ্মনন্দ ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করেছিলেন। মহাপদ্মনন্দের মা ছিলেন শূদ্রানী। তাঁর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্ররা নিজেদের হাতে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন। এতদিন যারা হয় ক্রীতদাস নয়তো দাসের মত জীবন যাপন করছিলেন তাঁরাই এবার হলেন দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। তখন কেউ শূদ্রদের উপর আর আগের মত অত্যাচার করতে পারতেন না। বিনা রক্ত-পাতে শান্ত ভাবে এত বিরাট পরিবর্ত্তন কখনই হতে পারে না। নিশ্চয়ই বিপ্লব ও রক্তপাত করে তবেই শূদ্রদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দিন কেটে যায় বসে থাকে না। এক এক করে বহুদিন হয়ে গিয়েছিল শূদ্রদের রাজত্ব। যাঁরা হয়েছিলেন দেশের রাজা তাঁরা শেষে আর গরীবদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আরও অন্য সব বড়লোকদের সঙ্গে মিলে তাঁরা এক নতুন শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা কেউ সাহস করে বেদের সমাজের বাইরে যেতে পারলেন না। নিজেদের ক্ষত্রিয় বলেই পরিচয় দিলেন।

এর পরেই আর একটি বড় বিপ্লবের যুগ হল মৌর্য বংশের রাজত্ব। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন শূদ্র। কৌটিল্য নামে এক মহাবুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে মগধের প্রাধান্য সমস্ত

ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। আফগানিস্থান থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে সাম্রাজ্য। তখনই ভারতে প্রথম বৈদেশিক দূত বিনিময় আরম্ভ হয়েছিল। এর আগে বেদে একবার শূদ্রদেষ রাজা হবার কথা আছে। কিন্তু তখন দেশে জাতিভেদ প্রথা তেমন ভাবে প্রচলিত ছিল না। কাজেই যে কোন শ্রেণীর লোকই সমাজে উন্নতি করতে পারতেন। তাতে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না।

কৌটিল্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে নানা শাসন সংস্কাব করেছিলেন। তিনি "আর্য" শব্দটির নতুন করে ব্যাখা দিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত শুধু বৈদিক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থামত যিনি চলতেন তাঁকেই আর্য বলা হত। বৈদিক যুগে শূদ্রদের কোনও রাজনীতিক অধিকারই ছিল না! কাজেই তাদের নাগরিক বা আর্য বলা হত না। শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরাই তখন ছিলেন নাগরিক। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে, যাদেব সম্পূর্ণ রাজনীতিক অধিকার ছিল সেইসব স্বাধীন নাগরিককে বলা হত "আর্য"। এবার প্রথম স্পষ্ট করে শূদ্রদেরও নাগরিক বলা হল।

আগে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসরা ছিল বেশির ভাগই শূদ্র। তাদের মত দুঃখের জীবন হয় না কারুর। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে এই দাসপ্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আইন করেছিলেন যে, ক্রীতদাসের সন্তান নয় এমন কোনও শূদ্রকে কেউ দাস বলে বিক্রী করতে পারবে না। পিতামাতা ক্রীতদাস হলেই আবার যে তাঁদের সন্তানও ক্রীতদাস

হবে তা হতে পারে না। বাপ মা যাই থাকুন না কেন সে হবে "আর্য।" আবার, যাঁরা ভাগ্য বিড়ম্বনায় আগে ক্রীতদাস হয়েছেন তাঁরা তাদের প্রভুকে টাকা ফিরিয়ে দিলেই স্বাধীনতা ফিরে পাবেন। অভিষেকের আগে প্রত্যেক রাজাকেই ঘোষণা করতে হত যে তিনি কারো উপর কোন অত্যাচার করবেন না।

শূদ্র চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোকের নাম সকলেই জানো। চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ কৌটিল্য। তাই তিনি শূদ্রদের নানা সুযোগ সুবিধা করে দিলেও নিজে ব্রাহ্মণ বলে তাদের অন্য সব উঁচুশ্রেণীর সঙ্গে একেবারে সমান আসন দিতে পারেন নি। অশোক ছিলেন আরো বিপ্লবী। তিনি দেশের সকল সম্প্রদায়কে সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন। আগে বিচারালয়ে ও আরও নানা ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সকলের উঁচুতে। ব্রাহ্মণদের শাস্তিও হত অন্যের তুলনায় খুব কম। অশোকের মতে ন্যায়ের চোখে কোন লোকই অন্যের চেয়ে বেশি সুবিধা পেতে পারে না। তাই তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির মধ্যের সমস্ত তারতম্য. তুলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি নানা আইনের জোরে ব্রাহ্মণরা যে সব অন্যায় সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতেন তা কেড়ে নিয়েছিলেন। অশোকের আমলে সমস্ত সম্প্রদায় থেকেই বেছে ভাল লোক নিয়ে শাসকমণ্ডলী সৃষ্টি হত। ব্রাহ্মণ কি অন্য কোন বিশেষ

শ্রেণী থেকেই চাকুরে নিতে হবে এ ব্যবস্থা তিনি তুলে দিয়েছিলেন।

শূদ্রের কাছে নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা নষ্টের অপমান ব্রাহ্মণরাও নির্বিবাদে হজম করেন নি। বহুদিন পরে অবশেষে পুষ্যমিত্র সুঙ্গ নামে একজন ব্রাহ্মণ সেনাপতি মৌর্যদের হারিয়ে এদেশে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। এর আগে ব্রাহ্মণরা কখনও নিজহাতে দেশ শাসন করেন নি। দেশ শাসন না করলেও লোক তাঁদের কথামত চলত বলেই রাজ্য দখলের কথা তাঁদের মনে উঠে নি। ব্রাহ্মণরা এতদিনে এক বিরাট রাজ্যের উপর কতৃত্ব বিস্তার করেছিলেন। আগের যুগের শূদ্রদের বিদ্রোহ দেখে তাঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আর বুঝেছিলেন যে, জোর করে দাবিয়ে না রাখলে শূদ্রদের সায়েস্তা করা কঠিন। মৌর্য আমলে এতদিন ধরে দেশের শূদ্ররা যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন তাই ব্রাহ্মণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা সব লোপ পেল। নতুন রাজত্বে আবার আগের পুরানো ব্যবস্থা চালানো হয়েছিল। মানুষে মানুষে এসেছিল অসাম্য।

তোমরা হয়তো "মনুসংহিতার" নাম শুনেছো। এটি পুষ্যমিত্র সুঙ্গের সমসাময়িক ধর্মশাস্ত্র। বিপ্লববিরোধী আন্দোলনের এটিই হল মুখপাত্র। এতে পরিষ্কার বলা আছে যে, ব্রাহ্মণরা ইচ্ছে করলে সেনাপতি বা রাজা দুই হতে পারেন। এই প্রথম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের রাজা হবার কথা লেখা হয়েছিল। তাছাড়া

শূদ্রদের দমন করবার জন্যে তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচারের ব্যবস্থাও দেওয়া আছে মনুসংহিতায়। তাঁদের রাজপদ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। কোনও শূদ্র আর কখনো বিচারকও হতে পারতেন না। শুধু শূদ্রই নয়, বৌদ্ধদেরও এতে অপমান করা আছে।

হিন্দুদের "মনুসংহিতা" পড়লেই বুঝতে পারবে যে, শূদ্রদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের ভয়ানক ঝগড়াঝাটি হয়েছিল আগে; তা না হলে কখন কেউ কারুর উপর এত শাস্তি ও অত্যাচারের ব্যবস্থা করতে পারে না।

এর পর থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা অবধি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ রাজত্ব চলেছিল। তখনই সমাজে নতুন করে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহুদিন ধরে রাজত্ব দখল করে অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছথেকে জোরকরে সম্মান আদায় করার ফলেই আজও সাধারণ লোক ব্রাহ্মণদের এত সম্মান দেখায়। সুঙ্গ বংশের কিছু পরেই দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রদেশীয় শতবাহনবংশ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণে আছে যে তাঁরা প্রায় ৪৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বজায় রাখার জন্য তাঁরা অত্যন্ত কঠিন নিয়ম কানুন করেছিলেন। জাতিভেদ প্রথা তাঁরা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে 'শতবাহন' ব্রাহ্মণ বংশ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আমলের বিজয়নগর সাম্রাজ্য পর্যন্ত

একটানা ব্রাহ্মণ রাজত্ব চলায় সেদেশের লোকেরা ব্রাহ্মণদের আরও বেশি ভয় করে চলে।

একটানা ব্রাহ্মণ রাজত্বের একটা ফল হচ্ছে এই যে, তাঁদের যেমন রাজার বংশ বলে লোক ভয় করে আবার তেমনি তাঁদের ভগবানের অংশ বলে মনে করেও গরীবরা বিদ্রোহ করতে সাহস পায় না। সেই সুযোগে ব্রাহ্মণরাও নানা ভাবে গরীবদের শোষণ করেন।

বাংলা দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে শ্রেণী সংঘর্ষের রূপ বোঝা আরও সহজ হবে। বাংলা দেশের গরীবদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই সমাজে অস্পৃশ্য। হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, জোলা, মালো এমনি নানা জাতিতে ভরে রয়েছে বাংলার গ্রাম। ভদ্রলোকরা তাদের দেখলে পাশ কাটিয়ে যান, মানুষ বলেই মনে করেন না তাদের। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, আজ বাংলায় যত অস্পৃশ্য শ্রেণী আছে তাঁরা কেউই আগে অস্পৃশ্য ছিলেন না। প্রাচীন কালে বাংলায় বহুযুগ ধরে বৌদ্ধ প্রভাব চলেছিল। তখন এই সব হাড়ী ডোম বাগ্দীরাই ছিলেন সমাজের স্তম্ভের মত। পুরানো বাংলা বই পড়লেই তোমরা এ সম্বন্ধে বহু খবর জানতে পারবে। বাংলা দেশে বৌদ্ধ প্রভাব এত বেশি ছিল যে কেউ বাংলায় এলে হিন্দুদের 'বৌদ্ধায়ন' প্রভৃতি ধর্ম-গ্রন্থে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া আছে। বৌদ্ধ প্রভাব বেশি ছিল বলেই হিন্দুদের কাছে বাংলা ভাষা পড়াই ছিল

ঘৃণার বিষয়। পাল রাজার সময়েও বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় প্রবল ছিল। তারপরে আরম্ভ হয়েছিল বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার। ক্রমশঃ যতই বাংলার সমাজে হিন্দুদের প্রতিপত্তি বাড়ছিল ততই বৌদ্ধ প্রভাব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বহু লোক হিন্দু ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। যাঁরা হিন্দু রাজার রাজত্বেও নিজেদের ধর্ম ছাড়েন নি তাঁদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে হিন্দুরা সমস্ত বৌদ্ধদেরই সমাজে পতিত করে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই বাগ্দী হাড়ী ডোম হয়েছিলেন অস্পৃশ্য। "ময়নামতীর গান" বইটি পড়লে তোমরা দেখবে একজন হাড়ী ছিলেন রাজার গুরু। আবার 'ধর্মমঙ্গল' বই এ তোমরা পাবে হাড়ী ডোম সেনাপতিদের বীরত্বের কাহিনী। তাহলে দেখ বাংলায় যখন বৌদ্ধপ্রভাব কেটে গিয়ে ব্রাহ্মণ রাজত্ব শুরু কিংবা মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন যে সব লোক হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নি তাঁরাই অস্পৃশ্য সমাজে পরিণত হয়েছিল।

শুধু যে বাংলাদেশেই এমন হয়েছে তা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম বহু ঘটনা আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ডেও এমনি হয়েছিল। লিথুয়ানিয়া আর পোলাণ্ড মিলে এক নতুন রাজ্য তৈরী হয়েছিল। বহু গোঁড়া গ্রীক চার্চের খৃষ্টান নতুন রাজত্বে চলে এসেছিলেন। তখন পোলাণ্ডের সম্রাট আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর সমস্ত প্রজা শুধু ক্যাথলিক ধর্মই

অনুসরণ করবে। যাঁরা গোঁড়া গ্রীক চার্চের খৃষ্টান ছিলেন তাঁদের টাকা পয়সা জায়গা জমি থাকলেও সম্রাট এক কলমের খোঁচায় সব অধিকার কেড়ে নিলেন। তাঁরা তখন থেকে সমাজে অস্পৃশ্য হয়েছিলেন।

পারস্যেও এমনিই হয়েছিল। আরব দেশের মুসলমানরা পারস্য দখল করে আগের শাসক শ্রেণীর লোককে সমাজে হীন করে দিয়েছিলেন। তাঁদের বলা হত কর দেওয়া কাফের বা জিম্মি (Jimhi)! এঁদের ছায়াও কেউ মাড়াতে চাইত না। আমাদের দেশেও এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে গুর্জর-প্রতিহার নামে এক রাজবংশের উল্লেখ আছে। 'গুর্জর' (Gurja।a) ও 'প্রতিহার' এঁরা একই বংশের লোক। এঁদের মধ্যে প্রতিহাররাই চিরকাল রাজত্ব করেছিলেন। গুর্জরদের হাতে শাসন ক্ষমতা না থাকায় তাঁরা সমাজের চোখে প্রতিহারদের চেয়ে হীন হয়ে পড়েছিলেন। সাঁওতাল পরগণার 'ভুঁইয়া' ও পশ্চিম বাংলার 'ভুইয়ারা' একই সম্প্রদায়ের লোক হলেও সাঁওতাল পরগণার ভুঁইয়ারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে জাহির করেন, অথচ বাংলার ভুঁইয়ারা অস্পৃশ্য চাষী হয়ে রয়েছেন। পরাধীন ছিলেন বলেই বাংলার ভুঁইয়ারা আজ অস্পৃশ্য।

সাধারণতঃ শূদ্ররা সমাজে নিম্নস্তরেই থাকতেন। আজকের দিনে আমরা জনসাধারণ বলতে যা বুঝি 'শূদ্র' বলতে আগে তাই বোঝাতো। এছাড়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে

বৈশ্যরাই ছিলেন সকলের নিচে। যাঁরা সমাজের গণ্যমান্য ছিলেন তাঁরা চিরদিনই বৈশ্য শ্রেণীকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। অথচ বৈশ্যবা সাধারণতঃ চাষবাস ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন বলে তাঁদের হাতে টাকা পয়সার অভাব হত না কখনো। টাকাব জন্যেই ছিল তাঁদের যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি। তখনকার বৈশ্য বড়লোকদের শ্রেষ্ঠী বলা হত। প্রত্যেক রাজদরবারেই দুচারজন শ্রেষ্ঠী থাকতেন। রাজার কোষাধক্ষ্য হতেন তাঁরাই! এক একজন শ্রেষ্ঠীর যে কত হীরা মুক্তা জহরৎ আর মোহব থাকত তার সীমাসংখ্যা ছিল না।

প্রাচীনকালে বৈশ্যদেরও আর্য বলা হত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বৈশ্যদের নিজেদের মধ্যেই নানা শ্রেণী বিভাগ দেখা দিয়েছিল। একদল শুধু ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আব একদল থাকলেন কৃষি কাজ নিয়ে। যাঁরা কৃষি আর গোপালন সম্বল করলেন তাঁরা বৈশ্য শ্রেণী থেকে জাতিচ্যুত হয়ে ক্রমে শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। বৈশ্যদের ব্যবসায়ী সংঘের কথা আগেই বলা হয়েছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ধনী শ্রেষ্ঠীরাই ব্যবসায়ী সংঘে কর্তৃত্ব করতেন। পরের যুগে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে বৈশ্যরাও নিজের হাতে রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন।

ভারতের ইতিহাসের বর্দ্ধন রাজবংশ হচ্ছে বৈশ্য শ্রেণীর। বর্দ্ধন

রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময় প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই বৈশ্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৈশ্য শ্রেণী রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করায় সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেজন্যেই বাংলা ছাড়া উত্তর ভারতের সব জায়গাতেই সমাজে বৈশ্যদের প্রতিপত্তি বেশি।

বৈশ্যরাও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মত নিজেদের ও "দ্বিজ" বলতেন। কিন্তু যতদিন তাঁরা নিজেদের হাতে রাজ্য শাসনের ভার না নিতে পেরেছিলেন ততদিন সমাজে তাঁদের প্রভাব বাড়ে নি। এথেকেও বুঝতে পারা যায় যে সমাজে যে শ্রেণীর হাতে যত বেশি ধনসম্পত্তি থাকবে রাজনীতিতেও সেই শ্রেণীর তত বেশি ক্ষমতা থাকবে ও লোকে তাঁদের তত সম্মান দেবে।

রাজ্য হাতে থাকলেই যদি সমাজের এক শ্রেণীর সম্মান বেশি হয় তাহলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার যে শূদ্ররাও তো অনেকদিন ধরে ভারত শাসন করেছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি অশোকও ছিলেন শূদ্র। অথচ এখনও তাহলে ভারতীয় সমাজে শূদ্রই সবচেয়ে হীন কেন? এর উত্তর একটু জটিল। বৈদিক যুগের পর ভারতীয় সমাজ ক্রমে ক্রমে সামন্ততন্ত্রের দিকে এগিয়েছিল। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বহুদিনব্যাপী সংঘর্ষ হতে হতে তবেই সামন্ত প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশে।

সামন্ত প্রথা কাকে বলে জানো ? আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষ ছিল সমান সমান। গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী লোক সেনাপতির কাজ করতেন। জমিজমা কারুরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। পরে যখন সমাজের সেই গোষ্ঠীপ্রথা ভেঙে গিয়েছিল তখন দেখা দিয়েছিল রাজা-রাজড়া। তাঁরা প্রথমেই সমস্ত জমিজমা নিজের বলে দাবী করেছিলেন। তারপরে নিজের খেয়াল খুশিমত যাকে ইচ্ছে সেই জমি বিলি করতেন। যাঁরা জমি পেতেন তাঁদের বলা হত সামন্ত বা মহাসামন্ত। এক এক সামন্তের অধীনে কামার, কুমোর, স্যাকড়া, কাঠমিস্ত্রী, ধোপা নাপিত সবাই বসবাস করতেন। তাঁদের কাউকেই খাজনা দিতে হত না। শুধু সামন্তের প্রয়োজন মত কাজ কর্ম করে দিতে হত বিনি পয়সায়। চাষীরাও ছিলেন বেগার খেটে দিতে বাধ্য। এই হল সামন্ত যুগ। সামন্ত যুগে জমিজমার আয়ই ছিল প্রধান। সামন্তরা নিজহাতে কোন কাজ করতেন না। তাঁরা সর্বদাই শৌর্যবীর্যের চর্চা করে সময় কাটাতেন। কায়িক পরিশ্রম করাকে তাঁরা ভীষণ ঘৃণার চোখে দেখতেন। সামন্তসমাজে যাদের গতর খাটিয়ে খেতে হত বড়লোকরা সবাই তাদের হেয় মনে করতেন।

শূদ্রদের প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত বলেই বোধহয় সামন্তসমাজে তাদের অবস্থা ক্রমশ হীন থেকে হীনতর হয়ে গিয়েছিল। লোক তখন ভুলেই

গিয়েছিল যে এই শূদ্ররাই একদিন ছিল দেশের সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

আগেই তোমরা শুনেছো যে ঋগ্বেদের যুগে শূদ্র বলে কোন শব্দ ছিল না। যজুর্বেদেই প্রথম শূদ্র শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তোমাদের আরও মনে থাকতে পারে যে বৈদিক যুগে শূদ্র শ্রেণীকে 'কেউ হীন চোখে দেখত না। শূদ্র ঋষিও ছিলেন যেমন, তেমনি শূদ্রের পক্ষে রাজা হবারও কোন বাধা ছিল না।

কিন্তু যতই দিন কেটে গেছে ততই সমাজে শূদ্রের স্থান হয়েছে হীন। প্রাচীনযুগে মনু থেকে শুরু করে মুসলমান রাজত্বের মাঝামাঝি বাংলার রঘুনন্দন পর্যন্ত সবাই শূদ্রদের উপর নানা অবিচার করেছেন। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রগুলো সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা। যতই আধুনিক যুগেব লেখা পড়বে ততই দেখবে যে পণ্ডিতবা শূদ্রদের উপর বেশি কঠোর হয়ে উঠেছেন। 'বৌদ্ধায়ন' অনেক পুরানো শাস্ত্র। তাতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেতর বিয়ের পর্যন্ত নির্দেশ দেওয়া আছে। 'আপস্তম্ভ' নামে আর একটি ধর্মশাস্ত্রে আছে যে আর্যদের তত্ত্বাবধানে থেকে শূদ্ররা সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের জন্য রেঁধে দিতে পারে; সে অধিকার তাদের আছে। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৬০০ থেকে আরম্ভ করে ৩০০ বছর আগে বৈদিক যুগের শেষেও শূদ্রদের অবস্থা এত উঁচু ছিল। এর পরে বশিষ্ঠ

নির্দেশ দেন যে শূদ্রের সঙ্গে অসবর্ণবিবাহ বিবাহ হওয়া উচিৎ নয়। তিনিই শূদ্রের বেদপাঠের অধিকারও কেড়ে নিয়েছিলেন। এমন কি তিনি বলেছিলেন যে, শূদ্রের সম্মুখেও বেদ পাঠ করা উচিত নয়। যীশুখৃষ্টের জন্মের পর একশো বছরের মধ্যে বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল। তাই এই ব্যবস্থা।

তারপরে আরও দিন কেটে গেলে মুসলমান আমলে মহারাষ্ট্র দেশের নাগভট্ট ও বাংলার রঘুনন্দন শূদ্রদের সম্বন্ধে আরও কঠিন নিয়ম করে দিয়েছিলেন। তাঁরা অন্য সবার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সবাই হলেন শূদ্র! বাংলার গ্রামে নিমন্ত্রণ খেতে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে এর মর্ম। সেখানে প্রথমে পাতা পড়ে ব্রাহ্মণের আর তারপরেই ডাক হয় শূদ্রদের! বৈদ্য, কায়স্থ—ক্ষত্রিয়,—এঁদের সবাইকেই শূদ্রের মধ্যে গণ্য করা হয়।

অন্য দেশেও শ্রেণীবিভেদ ছিল

ভারতের অতীত সভ্যতার সাক্ষী রয়েছে শত শত ধর্ম-গ্রন্থ, শাস্ত্রের বিধান আর সমাজ। এর প্রত্যেকটির উপরেই শ্রেণীসংঘর্ষের স্পষ্ট ছাপ আছে। গরীব জনসাধারণ—যাঁদের শূদ্র বলা হত—তাঁরাই সমাজের অন্যান্য মান্যগণ্য শ্রেণীর লোকের হাতে বেশি নিগ্রহ ভোগ করতেন এ কথা ঠিক। কিন্তু বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়রাও ব্রাহ্মণদের হাতে কম অত্যাচার সহ্য করতেন না। একথা সত্যি নয় যে, আর্যরা যে সব আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে ক্রীতদাস করে রেখেছিলেন কেবল তাঁরাই শূদ্র; আর পরাজিত শত্রু বলেই তাদের উপর এত অত্যাচার হত। বৈশ্য ক্ষত্রিয়রা তো আর শত্রু ছিলেন না। তবে তাঁদের উপর কেন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হত? আচারে, ব্যবহারে, আইনের চোখে, সব কিছুতেই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যের অনেক তফাৎ ছিল। সেটাই হচ্ছে ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে মানুষ যতই সামন্ততান্ত্রিক যুগে পা বাড়িয়েছে ততই এ বৈষম্য আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই যে ব্যবহারের তারতম্য তা শুধুমাত্র ভারতেই ছিল না। পৃথিবীর সব দেশেই ঠিক এই একই ধরনের শ্রেণীবিভেদ ছিল। মিশর,

মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, রোম ইত্যাদি সব দেশেই গরীব জনসাধারণের উপর পুরোহিত আর অন্য সকলে নানা অত্যাচার করতেন।

মিশর

নানা দেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলেই সে কথা বুঝতে পারবে তোমরা। প্রথমেই নাও মিশর।

আফ্রিকার উত্তরে নীল নদের দুপাশ জুড়ে মিশর সাম্রাজ্য। ইতিহাসের পাতার পর পাতা জুড়ে আছে মিশরের কাহিনী। মিশর উপত্যকার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, পুরোহিতরা একটি বিশেষ শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন। রাজা ছিলেন সেখানে নিজেই প্রধান পুরোহিত। রাজা ছাড়া আর যেসব লোক থাকতেন তাঁরাও পুরোহিতের কাজ করতেন। যখন রাজার ক্ষমতা কোনও কারণে কমে আসত, তখন পুরোহিতরা রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতেন।

একেবারে প্রাচীন কালে স্থানীয় লোকদের অন্য আর পাঁচটি কাজের মধ্যে পৌরহিত্যও ছিল একটা কাজ। ক্রমে রাজা ফেয়ারো নিজেকেই একমাত্র ঈশ্বরের সন্তান বলে প্রচার করেছিলেন। তখনো পুরোহিত আর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

মধ্যযুগে আগে মিশরে ছিল সামন্ততন্ত্র। সেদেশে যাঁরা যে কাজ করতেন তাঁদের ছেলেও বংশানুক্রমিক ভাবে সেই কাজ করতেন। তখন মিশরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকরা ভিন্নভিন্ন দেবতার উপাসনা করতেন। সেই সব দেবতাদের পুরোহিতদের তখন ক্ষমতাও বেড়ে গিয়েছিল। পুরোহিতরাও সেই সুযোগে ভগবানের দোহাই দিয়ে ধর্মের নামে জোর করে গরীবদের কাছ থেকে নানা পূজোর বন্দোবস্ত করাতেন। সাধ্য না থাকলেও গরীবদের সেগুলো মানতে হত। ধার করে তাঁরা সেই সব পার্বণে টাকা খরচ করতেন। সবচেয়ে বড়কথা ছিল যে, পুরোহিতরা সমাজের বড়ছোটর ভেদাভেদ বজায় রাখবার কথাই বলতেন সব সময়। গরীবরা সবাই ছিলেন প্রায় মূর্খ।

সামন্তযুগের বহুপরে মিশরে হিকশাস্ বংশ রাজত্ব করতেন। এতদিন সারা মিশর জুড়ে ছিল খুদে খুদে রাজ্য আর রাজা। হিকশাস্ বংশের আমলে সেই সব ছোট ছোট রাজ্য মিলিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা আর পুরোহিত এক জোট ছিলেন বলে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেদেশে পুরোহিতদেরও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর সেই সঙ্গে জমে উঠেছিল পুরোহিতদের সিন্দুকভরা ধনদৌলত। পুরুতগিরি করাই তখন অনেকে জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন। একবার পুরুতগিরিতে লাভের আস্বাদ পাওয়ায় দলে দলে লোক এগিয়ে এসেছিলেন পুরুতগিরির জন্য। একদিকে যেমন

পুরুতদের সংখ্যা ফেঁপে উঠেছিল আর একদিকে আবার তেমনি জনসাধারণের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব বসেছিল জেঁকে। রাজার চেয়ে যেন পুরোহিতদের ক্ষমতাই ছিল বেশি। দলে ভারী হলে পর পুরোহিতরাই এক বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন নিজেদের নিয়ে। রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের আর যোগাযোগ ছিল না তেমন।

বহুদিন কেটে গেলে সত্যি সত্যি দেখা গেল যে পুরোহিতরাই রাজার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান! তখন রাজন্য শ্রেণীর চৈতন্য দেখা দিয়েছিল। এমনি করে আরম্ভ হয়েছিল মিশরে যুগ যুগান্ত ধরে শ্রেণী সংঘর্ষ। রাজা আর পুরোহিতদের সংগ্রাম চলেছিল সে দেশে অনাদিকাল পর্যন্ত। সম্রাট্ ইখনাটন প্রথমে পাকাপাকি ভাবে পুরোহিত দমন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর পিতা পুরোহিতদের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেন নি। কিন্তু ইখনাটন পিতার মত ব্যর্থ হন নি। তিনি পুরোহিতদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের দেবতা 'আমনের' মন্দিরে তিনি বসিয়েছিলেন 'আটোন'-কে। কিন্তু এত করলে কি হবে। সম্রাট চলেছিলেন যুগের আগে আগে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবার পুরোহিতরা মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছিলেন। ইখনাটনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অলস আর অপদার্থ। তাঁরা পুরোহিতদের চটাতেই চান নি। পুরোহিতদের মতেই মত দিয়ে চলতেন সেই সব সম্রাট। কাজেই সম্রাটদের হাতে

রাজক্ষমতা থাকলেও পুরোহিতরা জয়ী হয়েছিলেন সেই শ্রেণীসংগ্রামে। রাজার সঙ্গে পুরোহিতের সংগ্রাম মিশরে আঠারো পুরুষ ধরে চলেছিল। আঠারো পুরুষের সময় ফেয়ারো হার্মহাব আবার পুরোহিতদের বিরুদ্ধে সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পরেই অবস্থা হয়েছিল যথা পূর্বং তথা পরম্।

'আমন' দেব হচ্ছেন মিশরের সবচেয়ে বড় দেবতা। তাঁর প্রধান পুরোহিত ছিলেন মিশরের সব পুরোহিতদের গুরুদেব। পুরোহিতের পদটাও হয়েছিল বংশানুক্রমিক। কালক্রমে এই পুরোহিত বংশই মিশরের 'থীব' প্রদেশের রাজা বলে নিজেদের ঘোষণা করেছিলেন।

পুরোহিতদের রাজত্বে দেশের গরীবদের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা ছিল না। তাঁদের ন্যায়অন্যায়ের কোন বাঁধা-ধরা মাত্রা ছিল না; খেয়াল খুশিমত তাঁরা দেশ শাসন করতেন। রাজা আর পুরোহিতের ঝগড়ার ফলে মিশর সাম্রাজ্যের ক্রমশঃই অবনতি হচ্ছিল। অবশেষে আসীরীয়'রা মিশর জয় করে নিয়েছিলেন।

মিশরের সমাজে তখন ছিল চারটি শ্রেণী। পুরোহিতরাই ছিলেন প্রধান। তারপর সৈনিক, কৃষক আর সাধারণ লোক—আমরা যাদের বলি শূদ্র। এই চার শ্রেণীর প্রত্যেকের কাজকর্মের ফলেই মিশর উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল।

মেসোপটেমিয়া

মিশরের কাহিনী তো তোমরা খুব সংক্ষেপে শুনলে। এবার আর একটি অতি প্রাচীন দেশের গল্প শোনো। আরব দেশের উত্তর-পশ্চিমে এখন যেখানে ধূ ধূ করছে মরুভূমি—সেখানেই অতি প্রাচীনকালে ছিল এক মহাসমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। তার নাম মেসোপটেমিয়া। শিক্ষায় সভ্যতায় এ জাতি ছিল অনেক উঁচুতে।

মেসোপটেমিয়ার সমাজেও ছিল নানা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। কোন একটি বিশেষ শ্রেণীকে নিয়ে সে সমাজ গড়ে ওঠে নি। সে দেশের ইতিহাসও হচ্ছে নানা শ্রেণীর ভেতর বাদবিসম্বাদের ইতিহাস। পুরোহিতরা ছিলেন সব চেয়ে শক্তিশালী। তাছাড়া অন্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্যবসায়ীরা। আমাদের দেশে যেমন বৈশ্যদের মধ্যে সংঘ-ব্যবস্থা ছিল, মেসোপটেমিয়াতেও ছিল তাই। তবে সে দেশের পুরোহিতরাও নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে সংঘ গড়েছিলেন।

হাম্মুরাবি ছিলেন মেসোপটেমিয়ার সব চেয়ে বিখ্যাত সম্রাট। তিনি যে আইন কানুন রচনা করেছিলেন তারই নকল করে পরের যুগে ইওরোপের প্রায় সব দেশেরই আইন তৈরী হয়েছিল। তোমরা হাম্মুরাবির আইনের বই পড়লে স্পষ্টই দেখতে পাবে যে, তাতে সমাজের

তিনটি শ্রেণীর নাম করা আছে। সরকারী আমলা, রাজ পরিষদ, মন্ত্রী, ও অমাত্যদের নিয়ে হল সব চেয়ে উঁচু শ্রেণী। তার নাম 'ঐলুম'। যে সব লোকজন ক্রীতদাস নয় অথচ যাদের জমিজমাও নেই তাদের নিয়ে হল দ্বিতীয় শ্রেণী। এদের বলা হত 'মুশকেন্নুম'। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল শুধু ক্রীতদাস। তাদের নাম 'আর্দ্দু'।

যাঁদের হাতে যত বেশি টাকা পয়সা থাকত তারাই সমাজে তত বেশি সম্মান পেতেন। ঐলুমরাই ছিলেন সমাজের সব চেয়ে ধনী। তাঁরা আর মুশকেন্নুমরাই শুধু ক্রীতদাস রাখতে পারতেন। ক্রীতদাসদের কোনই অধিকার ছিল না। তাঁরা সব বিষয়ে ছিলেন মালিকের অধীন। তবে আমাদের দেশের এখনকার মত এত জাতিভেদ প্রথা ছিল না সে দেশে। তাই এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোনটাই অস্পৃশ্য ছিল না। ঐলুম কি মুশকেন্নুম শ্রেণীর কোন মেয়ে ইচ্ছে করলে কোন আর্দ্দুকেও বিয়ে করতে পারতেন। ক্রীতদাসকে বিয়ে করলে তাঁর ছেলে মেয়েরা কিন্তু হত ক্রীতদাস। মা অবশ্য স্বাধীনই থাকতেন। স্বামী ক্রীতদাস হলেও স্ত্রীর উপর মালিকের হুকুম খাটত না। বিয়ের আগে যদি তাঁর নিজের কোনও ধন সম্পত্তি থাকত, তাহলে মালিক কি অন্য কেউ সে সব দাবী করতে পারতেন না। সে টাকায় তাঁর স্বামীরও কোন অধিকার থাকত না।

আইনের চোখে এই তিন শ্রেণী সমান ছিল না। বড়লোক-

দের জন্যে আইন ছিল খুব সুবিধের। ঐলুম শ্রেণীর কোনও দুজন যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করতেন, তাহলে তাঁদের শাস্তি হত সমান। কিন্তু ঐলুম শ্রেণীর কেউ কোন মুশকেনুমকে মারলে তাঁর শাস্তি ছিল মাত্র জরিমানা। আর যদি মুশকেনুম দুর্বুদ্ধি বশতঃ কোনও ঐলুমকে মারতেন, তাহলে তাঁর নিস্তার ছিল না। নীচু শ্রেণীর কেউ উঁচু শ্রেণীর কারুর গায়ে হাত দিলে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। আইন সব সময়েই ছিল বড়লোকের পক্ষে। ভারতে মনুর ধর্মশাস্ত্রেও এমনি শাস্তির তারতম্য আছে। সমাজের নীচু স্তরের লোকের উপর বড়লোকেরা সব দেশেই অত্যাচার করেছেন। আইন কানুন সবই গরীব-বড়লোকের জন্য ছিল আলাদা আলাদা!

পারস্য

এবার আমাদের প্রতিবেশী পারস্য দেশের উদাহরণ নেওয়া যাক। আজ যেমন পারস্যের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই, চিরদিন কিন্তু এমন ছিল না। আফগানিস্থান, পারস্য এ সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ।

আমাদের দেশে অবশ্য নানা জাতের লোকের বাস। এত ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোক ছিল না পারস্যে। পারসিকেরা

প্রধানত একই জাতির লোক। এঁরা ছাড়া অন্য দু একটি মাত্র জাতি ছিল পারস্যে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকলে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো থাকবে এগিয়ে আবার অন্যেরা থাকতে পারে পিছিয়ে। তখন সে সব জাতের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। সে ভেদ আর আমরা যাকে শ্রেণী-বিভেদ বলেছি তার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে, পারস্যের প্রধান জাতিটির ভেতরেই ছিল নানা শ্রেণী। সে দেশের শ্রেণী বিভাগ ছিল ঠিক ভারতবর্ষেরই মত! পারস্যের সবচেয়ে পুরানো শাস্ত্রের নাম 'আবেস্তা'। তাতে তিনটি শ্রেণীর নাম আছে। তারপরে সৃষ্টি হয়েছিল আর একটি শ্রেণী।

পারস্যের দেবতা ছিলেন 'জরাথুষ্ট্র'। তাঁর তিন ছেলে। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থে আছে যে, সে তিন ছেলের বংশধরদের নিয়েই এক একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ীদের কোন আলাদা শ্রেণী ছিল না পারস্যে। তাঁরা চাষীদের ভেতরই থাকতেন। তবে চাষ না করে করতেন ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসায়ীদের বলা হত 'হুতি'।

পারস্যের পুরোহিতরাও নিজেদের একটি ভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত করেছিলেন। পারস্যের প্রধান পুরোহিত থাকতেন "রাগাজ" নামে এক শহরে। সেখান থেকেই তিনি তাঁর হুকুম চালাতেন সারা দেশের পুরোহিতদের উপর। পুরোহিতদের ব্যবসা বা যজমানি ছিল বংশানুক্রমিক।

পুরোহিতের ছেলে ছাড়া অন্য কেউ পুরোহিত হতে পারতেন না। তবে পুরোহিতের ছেলে ইচ্ছে করলে অন্য যে কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন।

পুরোহিতদের পরেই উল্লেখ করতে হয় ক্ষত্রিয় শ্রেণীর। তাদের নাম ছিল 'রথাইষ্ট্র'। চাষীদের মধ্যে যাঁরা ধনী তাঁরা আর সৈনিকদের নিয়েই রথাইষ্ট্র শ্রেণী।

দেশে ধনী চাষীদের সম্মান ছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য। গবীব চাষীই ছিলেন বেশি। সমাজে তাঁদের কেউ সম্মান দেখাতেন না।

এসব ছাড়াও ক্রীতদাস বলে পারস্যে অন্য এক শ্রেণী ছিল। দেনার দায়ে যে সমস্ত দরিদ্র নিজেদের স্বাধীনতা বিক্রী করতে বাধ্য হতেন তাঁদের নিয়েই এই ক্রীতদাস শ্রেণী গঠিত। এদের নাম ছিল "বৈশু"।

এত সব ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভেতর কে বড হবে তা নিয়ে চিরকালই সংঘর্ষ লেগে থাকত। গরীবরা অত্যাচার সহ্য করতে না পাবলে বিদ্রোহ করতেন। দেশের আইন কানুন সব কিছুতেই গরীবদের জন্য ছিল ভিন্ন বিধান। কথায় কথায় তাঁদের শাস্তি দেওয়া হত। আর একই অপরাধের জন্য ধনীদের হত শুধু জরিমানা!

গ্রীস

শুধু যে এশিয়া কিংবা প্রাচীন মিশরেই শ্রেণীবিভেদ ছিল তা নয়। পৃথিবীর সব সমাজেই এক সময় শ্রেণী বিভেদ

দেখা দিয়েছিল। গ্রীসের ইতিহাস পড়লেও তোমরা একথা বুঝতে পারবে।

ইওরোপের ভেতর গ্রীসই সবচেয়ে প্রাচীন। ভূমধ্য-সাগরের উপরে ছোট্ট একটু পাহাড়ে ঘেরা দেশ। সমস্ত দেশ ছিল নানা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। ইংরাজীতে এগুলোকে বলে 'সিটি স্টেট্‌স্'। সিটি স্টেট্‌স্ কথার অর্থ হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি সিটি বা 'নগর'-ই ছিল এক একটি স্বাধীন 'স্টেট্' বা 'রাজ্য'। কোন বিদেশী শক্তি এসে এই 'নগর-রাষ্ট্র' গুলি প্রতিষ্ঠা করেন নি।

আদিম যুগে প্রায় সমস্ত 'নগর-রাষ্ট্রে'রই শাসকশ্রেণী আর প্রজারা সবাই ছিলেন এক জাতির। ক্রমে নানা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রত্যেক নগরেই অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোক এসে বসবাস করেছিলেন। আমাদের দেশে যেমন ছিল সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশের কথা, তেমনি গ্রীসের লোকও নিজেদের দেবতার বংশধর বলে মনে করতেন। 'হেলেন' ছিলেন গ্রীসের প্রধান দেবতা। তাঁর বংশধর বলে গ্রীসের লোকদের বলা হত 'হেলেনীয়'। সাধারণ লোকদের থেকে গ্রীসের অভিজাত শ্রেণী নিজেদের সব বিষয়ে আলাদা করে রাখতেন। তাঁরা সেজন্যেই নিজেদের দেবতার বংশধর বলতে রাজী ছিলেন না। গ্রীসের অতীতের গাথায় যে সমস্ত বীরপুরুষের নাম আছে অভিজাতরা তাঁদের বংশধর বলে গর্ব করতেন।

প্রাচীন কালেই গ্রীসের সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তারপর নতুন নতুন নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে যাবার সময় গ্রীসের সমাজের রূপ অনেক সময় বদলিয়েছিল।

পৌরাণিক যুগের গ্রীক সাহিত্যে বহু সেনাপতি বা রাজন্যদের নাম পাওয়া যায়। এঁরাই ছিলেন অভিজাত। এঁদের বাদ দিলে থাকতেন সাধারণ নাগরিক। তাঁরা ছিলেন স্বাধীন। তবে তাঁদের মধ্যেও কয়েকটি বিভাগ ছিল। সবচেয়ে গরীবের দলকে বলা হত 'থেটিস'। তাছাড়া ছিল বিরাট দাস শ্রেণী।

সে যুগে যাঁদের রাজা বলা হত তাঁদের প্রধান কাজই ছিল যুদ্ধবিগ্রহ। রাজাই ছিলেন গোষ্ঠীর অধিনায়ক। যুদ্ধ ছাড়াও তাঁরা করতেন পুরোহিতের কাজ। গোষ্ঠীর ভেতর কোনও গোলমাল কি মনোমালিন্য হলে তাঁকেই সব বিবাদের মীমাংসা করে দিতে হত। রাজার নীচে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হত 'ব্যাসিলিউস' বা রাজন্যশ্রেণী। রাজা ছাড়া রাজপরিবারের অন্য সবাইকে নিয়ে তৈরী হয়েছিল এই ব্যাসিলিউস শ্রেণী। দেশের বড় বড় জমিদারীর কর্তা ছিলেন তাঁরা। রাজা আর রাজন্য শ্রেণী ছাড়া যে সব সাধারণ নাগরিক ছিলেন দেশে, তাঁরা ছোট ছোট জমিজমা নিয়ে চাষবাস করে জীবন ধারণ করতেন।

গ্রীসের সেই প্রাচীন যুগের ইতিহাসেই আমরা প্রধানত দুটি বিভাগ দেখি—একটি দাস, অন্যটি মুক্ত নাগরিকের। মুক্ত নাগরিকদের মধ্যে যে নানা বিভাগ ছিল, তার কথা একটু আগেই তো পেয়েছো।

যীশুর জন্মের সাতশো বছর আগে রাজন্যশ্রেণী জোর করে সমাজের উপর নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন! এর পর থেকে রাজন্যশ্রেণীর লোক অন্য কোনও শ্রেণীর কাউকে বিয়ে করতে পারতেন না। রাজন্য শ্রেণী ছাড়া আর অন্য কেউ দেশ শাসন করতেও পারতেন না। পৌরাণিক যুগ থেকে গ্রীস যতই সভ্যযুগে এগিয়ে এসেছে ততই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আলাদা আলাদা হয়ে পড়েছিল। বাইরের দেশ বিদেশের সঙ্গে তখন গ্রীসের ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ হয়েছিল। ব্যবসাসূত্রে নানা বিদেশীর আনাগোনা হত গ্রীসে। কোনও গ্রীক সেই সব বিদেশীদের মধ্যে বিয়ে করতে পারতেন না। যা হ'ক একটু জমি থাকলেই সাধারণতঃ লোকরা মুক্ত নাগরিকের পর্যায়ে পড়তেন। বহুকাল পরে ধনীরা বিদ্রোহ ক'রে অভিজাতশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। এ বিপ্লবের পর সমাজ ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সমাজের শ্রেণী বিভাগের কড়াকড়ি গিয়েছিল কমে। বিপ্লবের পরে অভিজাতশ্রেণী ছাড়া অন্যের ভেতর থেকেও তখন রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হত।

আদিমযুগ থেকেই গ্রীসে যে সব নাগরিকের জমি জমা ছিল, শুধু তাঁরাই দেশের শাসন ব্যবস্থার জন্যে নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন। গরীব গ্রীসবাসীদের তো আর জমিজমা ছিল না। কাজেই তাঁদের ছিল নানা অসুবিধা। মহাবিপদ ছিল তাঁদের। দাস হলে পরে তাঁদের খাবার পরবার দায়িত্ব থাকত প্রভুদের উপর। অথচ নামে তাঁরা ছিলেন মুক্ত নাগরিক। কাজেই নিজেদের সংসার প্রতিপালন করবার দায়িত্ব ছিল তাঁদেরই ঘাড়ে। এদিকে তাঁদের হাতে না ছিল জমিজমা না টাকা পয়সা কিছু। দেশের বড়লোকরাও তাঁদের করতেন অবজ্ঞা! বাধ্য হয়ে তাঁরা দিন মজুরী কি অন্য কোনও ভাবে নিজেদের সংসার প্রতিপালন করতেন। ভূমিদাস প্রথাও গ্রীসে বহুযুগ ধরেই প্রচলিত ছিল।

ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে গ্রীসের সমাজের কয়েকটা বিশেষত্ব নজরে পড়ে। পৌরাণিক যুগে গ্রীসের প্রত্যেক পরিবারের কর্তাই করতেন পুরোহিতের কাজ। ক্রমে যখন ধর্মকর্ম বেড়ে গিয়েছিল তখন একদল স্থায়ী পুরোহিতের দরকার দেখা দিয়েছিল। সমাজের কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে তখন এই সব পুরোহিতদের কাজে লোক নেওয়া হয়েছিল। পুরোহিতদের কাজের সঙ্গে রাজকার্যেরও যোগাযোগ ছিল। পুরোহিতদের বিশেষ সম্মান দেখাবার নির্দেশ ছিল। তবে আমাদের দেশের মত রাষ্ট্রের যোগ ছাড়াই ধর্মকর্মের ব্যবস্থা গ্রীসে ছিল না।

সেজন্যে গ্রীসের পুরোহিত শ্রেণীও আমাদের মত এত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। গ্রীসে আমাদের মত পুরোহিতরা আলাদা শ্রেণী হিসেবে না গড়ে উঠতে পারলেও উত্তরকালে যে তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা এক শক্তিবান শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন সে বিষয় নিঃসন্দেহ। দার্শনিক প্লেটোও বলে গিয়েছিলেন যে, পুরোহিতদের বর্ণসংকর হলে চলবে না। তাঁদের চাই সুস্থ সবল দেহ।

তাছাড়াও ভীষণ ছুৎমার্গ ছিল গ্রীসে। কোন পূজা পার্বণের আগে আমাদের দেশের মত গ্রীসের পুরোহিতও সংযম করতেন। কোন কোন পুজোয় তাঁদের নিরম্বু উপবাস করতে হত। আবার কখনো কোন বিশেষ জিনিস না খেলেই চলত।

যে সমস্ত পেশার সঙ্গে ধর্মের নাম জড়িত থাকে প্রায় গ্রীক রাজ্যেই সেগুলো ছিল বংশানুক্রমিক। চারুকলার কাজেও ছিল এই ব্যবস্থা। পরের যুগে গ্রীসের সমস্ত পেশার লোকই নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গ্রীস দেশে নানা নগর রাষ্ট্র থাকায় কোন বিশেষ রাষ্ট্রের গঠনভঙ্গী বিচার করলেই আমরা তখনকার গ্রীসের সমাজের সত্যিকার রূপ জানতে পারব। স্পার্টা হচ্ছে এমনি এক রাষ্ট্র।

স্পার্টা রাষ্ট্রে ছিল অভিজাতদের প্রতিপত্তিই বেশি।

অভিজাত শ্রেণীর লোকজন নানা সুবিধা পেতেন। তাঁদের ভেতর থেকে লোক বেছে নিয়ে শাসকমণ্ডলী নির্বাচন করা হত। অভিজাত শ্রেণী ছাড়া আরও দুটি বিভাগ ছিল গ্রীক সমাজের। একটি "পেরিওকি" ও অন্যটি "হেলট।" অভিজাত "স্পার্টিয়াটি" শ্রেণী নিজেদের বিজেতা বলে গর্ব করতেন। পেরিওকি ও হেলটদের সঙ্গে কখনই এক জাতির যোগাযোগ তাঁরা স্বীকার করতেন না। অথচ ঐতিহাসিকরা কেউই অভিজাতদের এ দাবী মেনে নেন নি। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রোটের মতে পেরিওকি ও স্পার্টিয়াটি দু'শ্রেণীর ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত ছিল। তবে অবস্থা বিপর্যয়ের ফলে গরীব বলে পেরিওকিদের এত দুরবস্থা হয়েছিল। হেলটদের সম্বন্ধেও গ্রোটের এই অভিমত। তাঁর মতে হেলটদের অধিকাংশ যে স্পার্টিয়াটিদের একই বংশের, সে বিষয়েও কোনই সন্দেহ নেই। অনেক ঐতিহাসিক অবশ্য বলেন যে, হেলটরা গ্রীসের আদিম অধিবাসী, তাঁদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রে স্পার্টিয়াটি শ্রেণীর লোক গ্রীস দখল করেছিলেন। কিন্তু গ্রোট তাঁদের মতামত অস্বীকার করেন এবং তাঁর কথাই এখন প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, গ্রীসের সমাজে যে নানা শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। তবে গ্রীসের নানা শ্রেণীর ভিতর তফাতের কারণ ছিল আর্থিক অসামঞ্জস্য। ভিন্ন জাতির লোক বলে এক এক জাতি

নিয়ে কোন আলাদা আলাদা শ্রেণী গঠিত হয় নি সে দেশে।

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখতে পাবে যে, গ্রীসের সমাজ ব্যবস্থার সঠিক বর্ণনা পাওয়া মুস্কিল। কোন কোন রাষ্ট্রে বিজিত আর বিজেতা জাতির আলাদা লোকও হয়ত থাকতে পারে। তবে বেশির ভাগ রাষ্ট্রে একই জাতির লোকের ভিতরেই নানা শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল। এবিষয়ে ভারতের সমাজের সঙ্গে গ্রীসের যথেষ্ট মিল ছিল।

রোম

ইওরোপের অন্যতম প্রাচীন দেশ হচ্ছে রোম। বহুযুগ ব্যাপী বিরাট উত্থান পতনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে রোমেও কালক্রমে শ্রেণী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রোমের ইতিহাসের গোড়ার দিকে খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৭৫৩—৫১১ বছর আগে সেদেশে দুটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়—প্যাট্রিসিয়ান ও ক্লায়েন্ট (Patricians and Clients)। প্যাট্রিসিয়ানরা হলেন অভিজাত—ও ক্লায়েন্টরা খুব দীনহীন। প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণী ছিল আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাদের রাজনীতিক অধিকার ছিল তাদেরই শুধু নাগরিক বলা হত। আর সে অধিকার ছিল মাত্র প্যাট্রিসিয়ানদের। একজন সেনাপতি লাটিউম প্রদেশ জয় করে সে দেশের অধিবাসীদের

বন্দী করে এনে রোমে বসবাস করান। বিজিত দলটি প্যাট্রি-সিয়ানদের একই বংশের হলেও তাঁদের কোন রাজনীতিক অধিকার ছিল না। চলা ফেরা কাজ কর্মের স্বাধীনতা তাঁদের নষ্ট হয়নি বটে, তবু তাঁদের নাগরিক বলা চলে না। এঁদের বলা হয় প্লেব (Pleb)। খেতে পরতে পেলেও দেশের ভালমন্দে তাঁদের কোনও মতামত দেবার অধিকার ছিল না। যতদিন রোমে রাজার রাজত্ব চলেছিল ততদিন রাজা ছিলেন একাধারে শাসক আর পুরোহিত দুই-ই। রাজাকে বাদ দিলে থাকে প্যাট্রিসিয়ানদের তিনটি দল। তারা আবার প্রত্যেকে দশটি করে মোট তিরিশটি কিউরিয়াতে (Curies) বিভক্ত; প্রত্যেক কিউরিয়া আবার দশটি করে জেন-এ (Geus) বিভক্ত। প্রত্যেক কিউরিয়ার সবাই মিলে একসঙ্গে খাবার জন্যে খুব বড় বড় খাবার ঘর ছিল। সেখানে নির্দিষ্ট দিনে সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসতেন।

রোমান সমাজের ভিত্তি ছিল এক একটি পরিবার। পিতাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। তাঁর মৃত্যুর পর বড় ছেলে সে স্থান অধিকার করতেন। প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে জড়িত থাকত ক্লায়েণ্ট। ভারতবর্ষে বেদে যাদের "স্তি" ও "উপস্তি" বলে এঁরা কতকটা সেই জাতীয়। এঁদের অনেকে বাইরে থেকে পালিয়ে এসে হয়তো কোনো পরিবারের আশ্রয়ে বাস করতেন নয়তো অনেকে আবার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েও ক্লায়েণ্টে পরিণত হতেন। যিনি যে স্তরের লোক তাঁকে তাঁর গোষ্ঠীর

মধ্যেই বিয়ে করতে হত। অসবর্ণ বিয়ে রোমে চলত না। যদি বা কখনো কেউ লুকিয়ে তেমন বিয়ে করতেন তো তাঁদের কোন ছেলে-মেয়েদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হত না।

রাজা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও প্রধান পুরোহিত হলেও একটা আলাদা পুরোহিত শ্রেণী ছিল। নাগরিক ছাড়া কেউ পুরোহিত হতে পারতেন না। পুরোহিত হবার জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার হত।

যাঁদের প্লেব বলা হয়েছে তাঁদের নাগরিক অধিকার না থাকলেও স্বাধীনতা ছিল। তবে সে স্বাধীনতা তাঁরা একদিনেই পান নি। বহু সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তবেই তাঁদের মুক্তি এসেছে। আগে তাঁরা নাগরিক বা কিউরিয়া কারুরই মধ্যে পড়তেন না। তাঁদের ভোটেরও অধিকার ছিল না। রোমকদের উপাসনার জায়গায় গিয়ে তাঁরা উপাসনা করতে পারতেন না। পুরানো নাগরিকদের সঙ্গেও তাঁদের কোনও সম্পর্ক রাখতে দেওয়া হত না। তাঁদের শুধু জানতে হত নানা কর্তব্যের লম্বা ফিরিস্তী। রাজসেবা না করলে রক্ষে ছিল না। আবার নাগরিক না হলেও খাজনার হাত থেকে তাঁদের রেহাই ছিল না। এঁরাই রোমে কৃষি ও গোপালন করতেন।

প্যাট্রিসিয়ানরা কিন্তু শাসক ও পুরোহিত দুই-ই হতে পারতেন। প্লেবদের পুরোহিত হতেন প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্য থেকে। রোমের রাজদেবতার উপাসনার সময়ে প্লেবদের মন্দিরের কাছে

যাবার অধিকার ছিল না। ভারতবর্ষের মতই প্যাট্রিসিয়ানরাও তাঁদের এই ব্যবহার সম্বন্ধে ধর্মের দিক থেকে নানা যুক্তি দেখাতেন। তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, প্লেবদের সঙ্গে অসবর্ণ বিয়ে হলে পুরোহিতদের রক্ত দূষিত হয়ে যাবে এবং তখন আর দেবতার পূজা অর্চনা করা যাবে না।

রোমের সমাজে শ্রেণীবিভেদের এরকম ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া গরীব আর বড়লোকের ঝগড়া তো লেগেই ছিল। যাঁদের হাতে দেশের রাজনীতিক অধিকার ছিল তাঁরাই সমাজে সব সুখ সুবিধা ভোগ করতেন। সেই জন্যে যাঁরা নাগরিক নন, তাদের সঙ্গে আর প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছিল। সেই ভীষণ শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে রোমের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল।

বিপ্লবের পর নতুন ব্যবস্থায় প্লেবরা নাগরিক বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁরা সৈন্যদলে যোগ দিতেও পারতেন। প্লেবরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে সেনাপতিত্ব পেতেন বটে, কিন্তু তাঁদের কখনো রাজ্যশাসনের কোন কাজ করতে দিতেন না বনেদী প্যাট্রিসিয়ানরা।

প্লেবদের একটি দল বিপ্লবের ফলে নিজেদের উন্নতি করে প্যাট্রিসিয়ানের দলে ভিড়েছিলেন। তাঁদের আগের দলের মধ্যে আর জায়গা ছিল না। তাঁরা নিজেদের নিয়ে একটা ভিন্ন বনেদী শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন।

রোমের শ্রেণী বিভেদের মূলে ছিল অর্থনীতিক কারণ।

আগে পরিবার অনুপাতে কিউরিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। বিপ্লবের পর সমাজের বিভাগ হয়েছিল টাকা পয়সা প্রভাব প্রতিপত্তি আর বসবাসের জায়গা অনুপাতে। পরের যুগে আরও একটি বিপ্লব এসেছিল রোমের সমাজ জীবনে। কিন্তু তখনো বনেদী অভিজাত শ্রেণী কোনও রকমে নিজেদের প্রভাব বজায় রেখেছিল। সে বিপ্লবে প্লেবদের ক্ষমতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা পুরোপুরি ভোটের অধিকার পেয়েছিলেন। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের ব্যবসার সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজতন্ত্র ধ্বংস হবার পর রোমের সিনেট ও ম্যাজিস্ট্রেটরাই শুধু মাত্র পুরোহিত হতে পারতেন। তবে পুরানো কয়েকটি পুরোহিত পরিবার পরের যুগেও নিজেদের বনেদী ভাব বজায় রেখেছিলেন। তাঁরা সব সময়েই অভিজাত শ্রেণী থেকে পুরোহিত বেছে নিতেন। এঁদের আচার ব্যবহারের জন্ত নানা বিধি-নিষেধ ছিল। আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণকে কোন নীচ জাতি ছুঁয়ে দিলে তিনি অপবিত্র হতেন, তেমনি রোমেও ঐ সব বনেদী বংশের পুরোহিতদের কোনও ক্রীতদাস ছুঁয়ে দিলে তিনি নিজেকে অপবিত্র মনে করতেন। তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে তবে শুদ্ধ হতে হত।

জার্মানী

মধ্য যুগের ইওরোপে জার্মান সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল দুটি শ্রেণীকে ভিত্তি করে। একদলের হাতে থাকত সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা, আর একদল ছিল দাস। এছাড়া আরও এক শ্রেণী ছিল সেখানে। তাঁদের বলা হত লাইট (lite)। তাঁরা ছিলেন ভূমিদাসের মত, কোনও স্বাধীনতা ছিল না। তবে তাঁরা সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পেতেন। লাইটদের দাসত্ব ছিল বংশ পরম্পরাগত। এই সব গরীবরা কিন্তু ভিন্নজাতের লোক ছিলেন না কেউ। সবাই ছিলেন একই বংশের।

আরও কিছুকাল পরে উত্তর দেশের লোকেরা জার্মানী জয় করেছিলেন। তখন আগের যুগের ধনীরা সবাই নিজেদের নিয়ে একটা বনেদী সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এর পরে ফ্রাঙ্ক জাতির অভ্যুদয় হয়েছিল জার্মানীতে। সে সমাজে বনেদী শ্রেণী ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী ছিল—স্বাধীন, অর্দ্ধ-স্বাধীন আর ক্রীতদাস। ফ্রাঙ্করা ইচ্ছে করেই সমাজে স্বাধীন ও ক্রীতদাস শ্রেণীর মাঝে এই কয়েকটি স্তর সৃষ্টি করেছিলেন। পরের যুগে বংশ পরম্পরাগত ব্যবসায়ী শ্রেণী গজিয়ে উঠেছিল ও সেই সঙ্গে সৈনিকবৃত্তিও বংশানুযায়ী হয়েছিল। স্বাধীন জার্মানরা তখন কেউ হয়েছিলেন সৈনিক আর অন্যেরা চাষী।

পুরোহিত শ্রেণী ছিলেন আলাদা। সমাজের সব স্তরের

লোকের কাছে থেকেই তাঁরা সম্মান দাবী করতে পারতেন। ধনিকরাও মুখে বলতেন যে, তাঁরা অন্য সকলের-এর সমান সুখ ভোগ করছেন। কার্যত সমাজের সব সুখ ভোগের উপায় ছিল শুধু মাত্র তাঁদেরই একচেটিয়া। এঁদের মধ্য থেকেই রাজা নির্বাচিত হতেন। জমিজমা আর ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল এঁদের অনেক বেশি।

স্বাধীন নাগরিকরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। মা বাবা স্বাধীন হলেই সন্তান হতেন স্বাধীন নাগরিক। তাঁরা সাধ্যমত জমিজমা কিনতে পারতেন। সে জন্যে এঁরা বিচারালয়ে যেতে পারতেন ও জনসাধারণের সভাতেও এঁদের বসবার অধিকার ছিল। কতগুলি শাস্তির হাত থেকে রেহাই ছিল এঁদের।

প্রধানত যুদ্ধে পরাজিত লোকরাই হতেন ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের কোনও অধিকার ছিল না। তাঁরা নিজেদের নামে কোনও সম্পত্তি রাখতে পারতেন না। ক্রীতদাসের ছেলেরাও হতেন ক্রীতদাস। কোনও স্বাধীন নাগরিক ক্রীতদাসকে বিয়ে করলে তিনিও ক্রীতদাস বলে পরিগণিত হতেন। ক্রীতদাসের সমস্ত সম্পত্তিতেই ছিল প্রভুর অবাধ অধিকার। রাজা, বনেদীবংশ, স্বাধীন নাগরিকদের ভেতর যার তার সঙ্গেই বিয়ে হতে পারত।

সৈনিক ও রাজকর্মচারীদের বংশবৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেরাই এক নতুন বনেদী সম্প্রদায় তৈরী করেছিলেন।

ক্রমে ক্রমে এই বনেদী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ পাদ্রী, কি জমিদার হতে পারতেন না। তাহলেই দেখ শ্রেণী বিভেদের অস্তিত্ব জার্মানীতে ছিল ঠিক আমাদের দেশেরই মত।

ইংল্যাণ্ড

সবার শেষে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করা যাক। অন্য সব দেশের চেয়ে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস একটু বিচিত্র। এদেশ সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশের অধীনে ছিল অনেক দিন। আদিম ইংরাজদের বলে কেল্ট। আর বিজেতাদের নাম ছিল এ্যাংগ্লো-স্যাক্সন। বিজেতা ও বিজিতদের আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কালক্রমে দুটি সম্প্রদায়ের সবাই এমন ভাবে একে অন্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন যে তাঁদের ভেতর থেকে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সমাজ ব্যবস্থাও হয়েছিল নতুন। তাকেই বলা হয় ইংরাজী সমাজ।

প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সে দেশেও ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরানো ইংরেজী আইনেও নানা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ক্রীতদাসের উল্লেখ আছে। বাজারে কেনা, বন্দী অথবা বিজিতদেশের ক্রীতদাসের বংশধরদের নাম হল থিউ (thew); কখনো কখনো ঠিকা কাজের জন্যও

অনেকে অন্যের দাসত্ব করতেন। তাঁরা হলেন এসনে (Esne); কেউ দেনদার মহাজনের দেনা শোধ দিতে না পারলে দাসে পরিণত হতেন। তখন তাঁকে বলা হত ওয়াইট থিউ (Wite-thew)। আইনের চোখে তাঁদের কোনও দাবী ছিল না, কেউ টাকা পয়সা ধার দিতে পারতেন না কোন ক্রীতদাসকে। তবে ক্রীতদাসরা ইচ্ছে করলে নিজের আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে প্রভুকে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে স্বাধীন হতে পারতেন। ক্রীতদাসের ছেলেও হতেন ক্রীতদাস।

সমাজে যাঁরা ছিলেন স্বাধীন—তাঁদের মধ্যেও দুটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। একদলের হাতে ছিল জমিজমা, আর এক দল ছিলেন নিঃস্ব। যাঁদের জমিজমা কিছু ছিল না, তাঁদের বাধ্য হয়ে কোনো জমিদারের অভিভাবকত্বে থাকতে হত। সেই সব জমিদার ছিলেন এঁদের রক্ষাকর্তা।

যাঁদের জমিজমা ছিল তাঁদের মধ্যেও অনেক বিভাগ ছিল। টাকা পয়সার ও ধনসম্পদ অনুপাতে হত সে শ্রেণী বিভাগ।

রাজা নামে মাত্র নির্বাচিত হতেন। কার্যত সিংহাসন ছিল বংশ পরম্পরাগত।

নর্মান বিজয়ের আগে ইংলণ্ডে এক অভিজাত বংশ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজার আত্মীয় পরিজন নিয়েই ছিল সেই বনেদী বংশ। নর্মান বিজয়ের পরে, সেই বনেদী শ্রেণী

থেকেই আর্ল (earl) নামে একটি ধনী সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। যতই দিন কেটেছে ততই এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেড়েছিল । তখন সমাজের শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এ্যাংগ্লো-স্যাক্সন বিজেতারা যে অন্য জাতির লোক বলেই ইংলণ্ডে এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ হয়েছিল তা নয়। কালক্রমে বিজেতা ও বিজিত সবাইকে মিলিয়ে ইংরাজ জাতি গঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারের তারতম্য থেকে শ্রেণী বিভেদের সত্যতা লক্ষ্য করা যাবে। ইংলণ্ডের শ্রেণী বিভেদেরও মূলে আছে অর্থনীতিক কারণ অর্থাৎ যাঁর হাতে যেমন টাকা পয়সা থাকতো তাঁর স্থান ছিল সমাজে তত উপরে।

আদিম অবস্থা থেকে ইংল্যাণ্ড যতই সামন্তযুগের পথে পা বাড়াচ্ছিল, ততই সে দেশের সমাজে শ্রেণী-বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হয়েছিল।

ভারতীয় আর্য কারা

বইটা যতদূর পড়েছো তাতে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে হয়েছে যে, আমি নানা অদ্ভুত কথা বলছি। এতদিন ধরে যে সব কথা তোমরা শুনে এসেছো তা যেন এক তুড়িতেই আমি উড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের অধীর হলে চলবে না। আমাদের জাতির জীবনে আজ দেখা দিয়েছে এক মহাসংকট! আর তোমরাই হচ্ছ জাতির ভবিষ্যত। কাজেই যত কষ্টই হোক না কেন তোমাদের জানতে হবে আমাদের অতীতের ইতিহাস। মুহূর্তের জন্যও যেন তোমরা ভুলো না যে, দেশকে ভালবাসতে হলে সবার আগে সে দেশের ইতিহাস খুব ভাল করে জানতে হবে।

ভারতীয় আর্য কারা ছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতরা সবাই এক মত নন। সাম্রাজ্যবাদী জার্মান ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, আর্যরা ছিলেন সুপুরুষ শ্বেতকায় জাতি। তাঁরা উত্তর ইওরোপ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ সারা পৃথিবী জয় করেছিলেন। এঁদেরই একটি শাখা এসেছিল ভারতে। তাঁদের মতে এই সুসভ্য আর্য জাতি ভারতবর্ষে আসবার পর যতই পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিলেন ততই তাঁদের সঙ্গে নানা আদিম জাতির মিশ্রণ হচ্ছিল। তার ফলে ভাষা থেকে আরম্ভ করে আর্যদের শরীরের গঠন পর্যন্ত কালক্রমে বদলে গেল।

কিন্তু জার্মান নৃতত্ত্ববিদদের এই মত আবার ফরাসী বা ইতালীর পণ্ডিতরা কেউ মানেন না। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় নৃতত্ত্ববিদ সের্গি প্রমাণ করলেন যে, তিনি ইওরোপের নব প্রস্তর যুগের বহু সমাধি স্তূপে বিদেশী প্রভাব পেয়েছেন। এই সব বৈদেশিক আক্রমণকারীরা সভ্যতায় ইওরোপের লোকের চেয়ে ছিলেন হীন। এঁরা এসেই ইওরোপে শবদাহ প্রথা প্রচলন করেছিলেন। ইওরোপের চলতি ভাষাও এদের প্রভাবে ভিন্ন রূপ নিয়েছিল। এই মানব জাতিরই বিভিন্ন শাখাকে বলা হয় কেল্ট, জার্মান ও শ্লাভ। হিন্দুকুশ অঞ্চলে ইওরোপের প্রচলিত বিভিন্ন নামের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। সেজন্যে এশিয়া থেকেই এ জাতি ইওরোপে এসেছিলেন বলে অধ্যাপক সের্গির ধারণা। তাঁর মতে নিসংশয়ে এঁরাই ছিলেন ইওরোপের আর্যদের পূর্বপুরুষ।

আর্য জাতির কুলপঞ্জী নিয়ে এমনি বহু গবেষণা হয়েছে ইওরোপে। ভারতীয় আর্য কারা ছিলেন তাই নিয়েও গবেষণার শেষ ছিল না।

ভারতে যাঁরা বেদের স্তোত্র রচনা করেছিলেন তাঁদের বলা হয় আর্য। তাঁদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। ভারতের পাশেই, পারস্যে যে সব লোক থাকতেন তাঁদের ভাষা ছিল আলাদা। যাঁরা 'ঝেন্দ' ভাষায় কথা বলতেন ও 'আবেস্তা' ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তাঁরাও নিজেদের 'আইর্য' বলতেন। ভাষাতত্ত্ববিদের মতে বহু বহু যুগ আগে এ দুই ভাষা-ভাষী

লোকের খুব নিকট সম্বন্ধ ছিল। কালক্রমে ঘটনা স্রোতে এঁরা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে পড়েন।

ঋগ্বেদে 'নদীস্তুতি' বলে এক স্তোত্র আছে। তাথেকেই প্রধানত আর্যদের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। স্তোত্রের প্রথম নদীর নাম হচ্ছে গঙ্গা। তারপর যমুনা ও সরস্বতী। গঙ্গানদী হচ্ছে সবার পূর্বে, তার পশ্চিমে হল অন্য সব নদী। এর পরের নদীগুলির নাম যথাক্রমে "কুভা" (আধুনিক 'কুবই'), "ক্রুমু", "গোমতী" ও "রাস"। পণ্ডিতেরা বর্ত্তমানের কাবুল নদীকে বলেন পুরাকালের "কুভা" নদী। ক্রুমু ও গোমতী নদী হচ্ছে যথাক্রমে "কুরুম" ও "গোমল" নদীর অন্য নাম। পরের নদীগুলি সবই ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তদিয়ে প্রবাহিত। শুধু মাত্র "রাস" নদীর কোন অস্তিত্ব এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। অনেকের মতে এটির কোন অস্তিত্বই ছিল না কোনও দিন।

এই সমস্ত প্রমাণ থেকে "ৎসিমার" (Zimmer) নামে এক পণ্ডিত মন্তব্য করেন যে, বৈদিক জাতি সমূহের আদিম বাসস্থান হচ্ছে পাঞ্জাব ও পূর্ব-আফগানিস্থানে।

সব পণ্ডিত কিন্তু আবার এমত মানেন না। নৃতত্ত্ববিদ পারগিটের (Pargiter) বলেন যে, বৈদিক কুলগুলি উত্তর পশ্চিম থেকে ভারতে ঢোকে নি। তাঁর মতে নদীগুলির নাম যখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবৃত্তি করা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই মানুষও পূর্ব থেকেই পশ্চিমে

চলাচল করেছে। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, ভারতের কোনও উপাখ্যান বা পুরাণে এরকম উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে বৈদেশিকদের আগমনের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিন্দুরাও কখনো পাঞ্জাব বা আফগানিস্থানকে পবিত্র বলে মনে করেন না। যদি সত্যিই সেদেশ তাঁদের জন্মভূমি হত তাহলে সে দেশকে তাঁরা পবিত্র বলে না মনে করে পারতেন না। তাঁরা বরঞ্চ হিমালয়ের ঠিক মধ্যের এক অঞ্চলকে পবিত্র বলে মনে করেন। ভারতের উপাখ্যানে উত্তর-কুরু বলে যে দেশের উল্লেখ আছে তাকেই তিনি আর্যদের উৎপত্তিস্থান বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ থেকে আমরা শুধু জানতে পারি যে, বৈদিক কুলগুলি নিজেদের বলতেন আর্য আর শত্রুদের বলতেন দস্যু, দাস বা অসুর। হয়তো এঁদের দু'দলের ধর্মও ছিল আলাদা। কখনো তাঁরা নিজেদের আর্যবর্ণ আর শত্রুদের দাসবর্ণ বলতেন।

আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে একথা জানা যায় যে, পৃথিবীতে কখনো কোন বিশুদ্ধ জাতি ছিল না। একই বংশের লোক নিয়ে কোনও জাতি গঠিত হয় না। প্রত্যেক জাতিতেই বাইরের নানা বংশের মিশ্রণ আছে। আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ বলেন যে, ভারতেরও বৈদিক যুগের লোকেরা নানা বংশের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছিল। আর্যরা

ছিলেন এক ভাষাভাষী। তাঁরা সবাই এক জাতির ছিলেন না। আফগানিস্থানের লোকরা প্রধানত হিন্দী-ইওরোপীয় ভাষায় কথা বলতেন। সেদেশে হিন্দী-ইওরোপীয় ভাষার মধ্যে আবার দুটো শাখার প্রচলনই বেশি দেখা যায়। হিন্দুকুশের দক্ষিণাঞ্চলের লোকরা যে ভাষায় কথা বলেন সংস্কৃত গ্রন্থে তার নাম দেওয়া আছে "পৈশাচ প্রাকৃত।" গ্রিয়ারসন প্রভৃতি পণ্ডিতরা এই ভাষাকে সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষা বলে মনে করেন। নৃতত্ত্ববিদের মতে এই অঞ্চলের লোকের সঙ্গে ভারতীয় সমভূমির লোকের মিল ছিল খুব বেশি।

নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদেরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, হিন্দুকুশের উত্তরাঞ্চলের লোকেরা 'এরানীয়' (Eranian) ভাষায় কথা বলতেন। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পিশাচ প্রাকৃত ভাষায় যাঁরা কথা বলতেন তাঁদের মধ্যে 'দার্দ' (Dard) জাতি ছিল অন্যতম। প্রথমে আর্যরা এঁদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখতেন না। পরে তাঁরা দেখলেন যে, এক দেশে বাস করতে গেলে দার্দ প্রভৃতি অনার্যদের সংশ্রব এড়ানো অসম্ভব। তখন তাঁরা চাইলেন কোনও রকমে এঁদের সমাজে চল করিয়ে দিতে। তাই এই জাতিকেই মনু তাঁর শাস্ত্রে ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছিলেন। এঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, যথা সময়ে এই শ্রেণীর ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় না নেওয়ায় পতিত বা

"ব্রাত্য" হলেন। পরের যুগে এঁরাই শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। ৎসিমারও বলেন যে, ব্রাত্যরা আর্য হ'লেও ব্রাহ্মণদের সমাজ ব্যবস্থা মেনে নেন নি বলেই সমাজে পতিত ছিলেন।

বেদে যে অঞ্চলকে 'ব্রহ্মাবর্ত' বলা হয়েছে তাতেও যে সব একই জাতির লোক বাস করত তা নয়। সেখানেও বহু জাতির লোক থাকত। পাঠান, কাফির, তাজিক ছাড়া অন্যান্য এরানীয় ভাষা ভাষী জাতিরও অস্তিত্ব পাওয়া গেছে সেদেশে। এমন কি দাক্ষিণাত্যের 'দ্রাবিড়ী' ধরনের লোকও জাঠ ও শিখের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর্মেনীয় রক্তও ব্রহ্মাবর্তের লোকের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের লোক গণনার সময় ১৯৩১ সালে তা ধরা পড়েছে।

এসব আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে ভারতীয় আর্য বলতে আমাদের এতদিন যে ধারণা ছিল তা ভুল। নানা জাতির লোক নিয়েই তৈরী হয়েছিল ভারতীয় আর্যদের সমাজ। তাঁদের প্রধান বাসস্থান ছিল হিন্দুকুশ অঞ্চল। হিন্দুকুশের দক্ষিণের লোকরাই ছিলেন বেদের যুগের আর্য। তাঁদের ভাষা ছিল বৈদিক যুগের সংস্কৃত। যাঁরা বেদের সভ্যতাকে স্বীকার করতেন না তাঁরাই ছিলেন ব্রাত্য বা পতিত।

জাতিভেদ কেন হয়েছিল

অনেক পণ্ডিতের মতে ভারতের হিন্দুসমাজের জাতিভেদের মূল কারণ হচ্ছে বিজেতা এবং বিজিত জাতির ভেতরের পার্থক্য। তাঁদের মতে আর্যরা এদেশে এসে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক দেশে থাকতে গেলেই দু'দলে মেলামেশা হতে বাধ্য। বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অসামাজিক বিবাহ হতে আরম্ভ করেছিল। তখন আর্যরা নিজেদের বংশ কৌলিন্য বজায় রাখবার জন্য নানা বিধিনিষেধের গণ্ডী তৈরী করে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করলেন। যাঁর শরীরে যত বেশি আর্য রক্ত ছিল—তিনিই ছিলেন তত উঁচু জাতির লোক।

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, তাঁদের এ মত ঠিক নয়। যাঁদের আর্য বলা হয় তাঁরা মোটেই এক জাতির লোক ছিলেন না। সংযুক্তপ্রদেশ, বাংলাদেশ সমস্ত জায়গাতেই নৃতত্ত্ববিদরা মানুষের আকৃতির সঙ্গে সামাজিক সংস্থানের তুলনা করে কোথাও এই মতের সমর্থন পান নি। এদেশে মাথার বিশেষ আকৃতি বা নাকের গড়ন কোনও একটি জাতিরই একচেটিয়া নয়। ভারতীয় আর্যদের যেমন মাথার গড়ন তেমনি গড়ন দেখা যায়

অস্পৃশ্য "পারিয়া" জাতির মধ্যে। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতের মধ্যেই নানা বংশের লোক দেখা যায়। এমন কি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একই জাতের লোকরাও এক বংশ থেকে উদ্ভূত নন। ভারতবর্ষের ১৯৩১ সালের লোক গণনার হিসেবে আছে যে, বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। পোদ, মাহিষ্য ও নমশূদ্রেরাও একই বংশের। অতএব পবিত্র ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্র কায়স্থের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় তখন উপরের মতই ঠিক বলে মনে হয়। মালাবারের নায়ার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, আর বাংলার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বংশগত মিল আছে অনেক।

জাতিভেদ ব্যবস্থার মূলে হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ।

এবার দেখা যাক কি কি অর্থনৈতিকে কারণে ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হল। অতীতের সংস্কৃত গ্রন্থে শুধু চারটি জাতির উল্লেখ আছে। অথচ আমরা আজকের সমাজে আরও অনেক বেশি শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাই। আবার মনুর শাস্ত্রেও নানা বর্ণসংকর জাতের নাম করা আছে। অসবর্ণ বিবাহের ফলে যে সমস্ত সন্তানের জন্ম হয় তাদের নিয়ে গঠিত হয় বর্ণসংকর জাতি। মনুর মতে এঁরা কে কি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারই উপর জাতিভেদ নির্ভর করে। পরবর্তী কালে জাতকের উপাখ্যান থেকেও মনুর মতই প্রমাণিত হয় যে, পুরাকালে

ভারতে সাধারণত এক এক জাতি এক এক বিশেষ কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন।

বৌদ্ধযুগের আগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও শ্রেণীবিভাগ ছিল; কিন্তু তখন এত ভিন্ন ভিন্ন জাতের (caste) অস্তিত্ব ছিল না। সবর্ণ বিবাহ, কোন শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা, এক সঙ্গে খাওয়া এসব ব্যাপার কোনটাই ভারতের আর্যদের নিজস্ব কিছু নয়।

বৈদিক যুগে ভারতের যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের কাজও ছিল আলাদা আলাদা। কিন্তু এক এক শ্রেণীতে যত লোক থাকতেন তাঁরা নিজেদের কাজ করার পরেও প্রচুর অবসর পেতেন। সাধারণ লোক সবাই যে সব সময় চাষবাস করতেন তা নয়। আবার যেখানে যত শূদ্র আছে সবাই যে চাকর হয়ে খাটতেন তাও বলা যায় না। তেমনি যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা যে সমস্ত সময়ই যুদ্ধবিগ্রহ করতেন তাও নয়। সমস্ত ব্রাহ্মণও হয়তো সারাদিন পূজা অর্চনায় কাটাতেন না।

সবাই যে সবসময় নিজের শ্রেণীগত কাজ করতেন না তারও বহু প্রমাণ আছে। পৌরাণিক যুগে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে আছে যে, একজন ব্রাহ্মণ নিজে হাতে হলকর্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সমাজের চোখে তিনি কোনও দিন পতিত হননি। রামায়ণেই আরও বহু কারিকরের উপাখ্যান আছে। তাঁরা এত নিপুণ ভাবে কাজ করতে

পারতেন যে, সমাজের সবাই তাঁদের খুব সম্মান দিতেন। এই সব কারিকররা এক হয়ে আবার সংঘ গড়েছিলেন। বৌদ্ধ-যুগের ঠিক আগেই ভারতের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আরও ভাল খবর পাওয়া যায়। তখন দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ছাড়া আরও নানা ছোট বড় বিভাগ ছিল সমাজে। এবং কেউ এক শ্রেণীর লোক হয়ে অন্য জাতির কাজ করলে তাতে সমাজে নিন্দার কিছু ছিল না। জাতকে আছে যে, একজন ক্ষত্রিয় কুমোরের, ঝুরিবানানো, ফুলের মালা গাঁথা ও রাঁধুনীর কাজ করেছিলেন। তাতে তাঁর সম্মানের কোন হানি বা শাস্তি কিছুই হয়নি। জাতকে আরও উপাখ্যান আছে যে, এক শ্রেষ্ঠী দর্জি ও কুমোরের কাজও করেছিলেন।

বৈদিক সমাজে মানুষ যে কোন শ্রেণীর কাজ করতে পারতেন। পরে পৌরাণিক যুগে কারিকরের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল ও সেজন্য তাঁদের মধ্যে কারিকরদের সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক পণ্ডিতের মতে বৈদিকযুগেও কারিকরী-সংঘের অস্তিত্ব ছিল। তখন তাদের বলা হত "গণ"। বৌদ্ধযুগে যখন জাতক লেখা হয়, তখন নানা শ্রেণীর লোকের সংঘ এদেশে ছিল। ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে সংঘ গড়তেন। নিজেরাই আমোদ প্রমোদ করতেন। আইন, বিচার আর শাসন এ তিনটি ছিল তাঁদের কাজ। সংঘের প্রবেশাধি-কার বংশক্রমে বাবা থেকে ছেলে পেতেন। কদাচিৎ কখনো বাইরের লোককেও নেওয়া হত।

সে যুগে ভারতে বেশ ভাল শিল্প সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ীরাও বংশপরম্পরায় ব্যবসাই করতেন। তবে ব্যবসায়ীদের সংঘের চেয়ে কারিকরের সংঘ ছিল ঢের বেশি শক্তিশালী। ঐধরনের সংঘগুলিই সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিল। ইংরাজীতে এ সব সংঘের নাম 'গিল্ড'।

প্রধান চার শ্রেণীর লোকত ছিলেনই। তাছাড়া অবসর সময়ে যিনি যে কাজ করতেন তাই নিয়ে গড়ে ওঠা ভিন্ন ভিন্ন দলের অস্তিত্বও ছিল অনেক। আইনের হাত থেকে নিজেদের দলের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে ও আরও নানা অর্থ নৈতিক কারণ থেকেই সংঘ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। দেশ বিদেশে যত ব্যবসায় বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল সংঘের কাজও ততই গিয়েছিল বেড়ে। ক্রমে ক্রমে সংঘগুলোর ভেতর নানা কঠোর বিধিনিষেধ তৈরী হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া ও বিবাহ ব্যাপারে কঠিন বিধিনিষেধ হওয়ায় সংঘগুলোকে এক একটা জাতি বলে ভুল হত। ক্রমে এ ব্যবস্থায় শত শত বৎসর কেটে গেছে, আরও হয়েছে নানা অদল বদল। চারটি শ্রেণী ভেঙে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ অনুপাতে নানা অসংখ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ভেতর প্রথমে এই সব সংঘের তেমন প্রাধান্য ছিল না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, এদুটি শ্রেণীর লোকসংখ্যা ছিল কম। তাঁরা সংখ্যায় কম হলে

আলাদা আলাদা দল না হয়ে এক দলেই ছিলেন। রাজা, তাঁর আত্মীয় স্বজন ও জমিদার শ্রেণী নিয়ে যে ক্ষত্রিয় শ্রেণী সৃষ্ট হয়েছিল তাই পরে একটি জাত হয়ে উঠেছিল। এঁদের হাতেই রাজ্যের ক্ষমতা ছিল বলে অন্য বিশেষ দল বেঁধে নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার কোন প্রয়োজন হয়নি। মৌর্যযুগে ক্ষত্রিয়ের হাতে রাজত্ব ছিল না। শূদ্ররাই ছিলেন রাজা। ক্ষত্রিয়দের স্বার্থ তখন কে দেখে ? মৌর্যযুগে তাই প্রথম ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও সংঘের প্রচলন হয়েছিল। সংঘভুক্ত ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ ও ব্যবসায় দুই উপায়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনেক পুরাকালে সুরাষ্ট্র দেশে [আধুনিক গুজরাটে] এধরনের ক্ষত্রিয় সংঘের অস্তিত্ব ছিল ।

ব্রাহ্মণ শ্রেণী কোনও দিনই নিজেদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে ধরাবাঁধা জাত সৃষ্টি করেন নি। তাঁরা সব সময়েই পূজা অর্চনা ছাড়াও কৃষি ব্যবসায়, বাণিজ্য, ও অন্যান্য নানা কাজ করে প্রাণ ধারণ করতেন।

শূদ্রদের মধ্যেও আগে কোন সংঘ ব্যবস্থা ছিল না। কারিকর শ্রেণীর যে সমস্ত সংঘ ছিল তাতে শূদ্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। অর্থোপার্জনের সময় শূদ্র ও বৈশ্যরা অনেক সময় একসঙ্গে কাজকর্ম করতেন। সেজন্যে বৈশ্যদের মধ্যের সংঘের মত শূদ্রেরাও পরের যুগে নিজেদের নানা সংঘ গড়ে তুলেছিলেন।

শূদ্রদেরও নিচে একদল লোক ছিলেন যাঁদের কোন জাতের

বালাই ছিল না। তাঁরা হয়ত বাঁশ কেটে তাথেকে বাক্স পেটরা তৈরী করতেন, নয়ত চামড়ার কাজ করতেন। মোটকথা যে শ্রেণী যত হীন কাজ করতেন সমাজে তার স্থানও হত তত নিচে। আজকের যে এত সব জাত দেখছো চারপাশে—তার কোনটাই ধর্মের বিধান থেকে হয়নি। হয়েছে নিজেদের কাজ কর্ম অনুসারে।

প্রাচীন ভারতে "শ্রেণী" সংগঠন

আগের অধ্যায়ে তোমাদের বলেছি যে, সংঘ ব্যবস্থাই হচ্ছে জাতিভেদের মূল কারণ। এবার সংঘ ব্যবস্থার কথাই বলবো। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সবাই নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে প্রাচীন ভারতে সংঘ গড়েছিলেন। তার উদাহরণ পেয়েছ কারিকর ও ব্যবসায়ী সংঘ থেকে। সংস্কৃতে এই সমস্ত সংঘকে "শ্রেণী" বলা হত।

কি করে এই সমস্ত সংঘ কাজ করত তা বুঝতে হলে অন্য দেশের সংঘের কার্যকলাপের খবরও রাখতে হবে।

এশিয়া মাইনরেও বহু বহু যুগ থেকে সংঘ ব্যবস্থা চলে এসেছে। আনাতোলিয়ার মালভূমিতে যে সব শ্রমিকরা বাস করতেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে সংঘ ও বিরাদরী স্থাপন করেছিলেন। সেমিয়াফোরই (Semiaphoroi) নামে একটি সংঘের উদাহরণ নেওয়া যাক। শব্দটার অর্থ হচ্ছে' 'পতাকা বাহক।' এই দল থেকেই বর্ত্তমান যুগের মুসলিম দেশগুলোতে দরবেশের উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য সংঘের মত পতাকা বাহকরাও নিজেরা মিলে সংঘ তৈরী করে এক বিশেষ দেবতার পূজা অর্চনা শুরু করেছিলেন। রোমক সম্রাটদের যুগে এঁদের অস্তিত্বের ইতিহাস পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতেও তুরস্কে এই ধরনের সংঘ দেখা গিয়েছে। সংঘের প্রাচীন সভ্যরা নিজেদের

জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে সব কিছু বিদ্যা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে শিখিয়ে দিতেন। সংঘের অধ্যক্ষ নিজে সমস্ত কাজ দেখাশোনা ও পরিচালনা করতেন। আইনকানুন বিধি নিষেধও তিনিই গড়তেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারুর ছিল না।

রোমক যুগের শাসনকর্তারা কারিকরদের সংঘগুলোকে রীতিমত ভয় পেতেন বলে জোর করে সে সব দাবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তা হলে কি হবে। রোমেও সংঘ ব্যবস্থার প্রচলন না ছিল এমন নয়। পরিবার ও জনের সংগঠনের মতই ছিল সে সব সংঘের গড়ন। সংঘগুলোর আলাদা আলাদা দেবতা ও মন্দির থাকত। তাঁতি, মুচি, ডাক্তার, শিক্ষক, পটুয়া এঁদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংঘ ছিল। মিনার্ভা ছিলেন কারিকরদের দেবী। আমাদের দেশের কারিকরদের দেবতা কে তা বোধ হয় তোমরা জানো। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন এঁদের দেবতা।

রাজা রাজড়ার অত্যাচারে ইওরোপে বহুদিনের জন্য সংঘ ব্যবস্থা লোপ পেয়েছিল। পরে অবশ্য আবার অন্য রূপ নিয়ে এই সব সংঘ গড়ে উঠেছিল নানাদেশে। রোমক সাম্রাজ্যের আমলে তুরস্কের পতাকাবাহকদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। রোমক শাসকরা সংঘ ব্যবস্থার বিপক্ষে থাকায় গোপনে গোপনে এসমস্ত সংঘ চালাতে হত।

মধ্যযুগে ইওরোপেই সংঘ ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালকরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেদেশে সংঘকে গিল্ড বলা হত (Guild)।

কালক্রমে গিল্ডের রূপ বদলাবার ফলে এর নানা বিভাগ দেখা দিয়েছিল। প্রথমত পাদ্রীরা নিজেদের নিয়ে করেছিলেন ধার্মিক সংঘ। পরে সাধারণ লোকও সেই সংঘে যোগ দেওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন। তবে তাঁদের স্ত্রীরা সংঘে প্রবেশাধিকার পান নি। সাধারণ লোকরা কিন্তু তাবলে পাদ্রী-দের সঙ্গে সমান অধিকার পেতেন না। খাবার সময় তাঁদের আলাদা আসন পড়ত ও কোন আলোচনায় তাঁদের ভোট দেবার ক্ষমতা থাকত না। বড়লোক আর গরীব পাদ্রীদের টাকার অনুপাতে আবার নিজেদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সংঘ ছিল। পরের যুগে খৃষ্টীয় ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের জোয়ারে এই সমস্ত সংঘ ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছিল।

শহরের বা ব্যবসায়ীদের গিল্ডগুলোতে বংশ পরম্পরায় ছেলে বাবার গিল্ডে সহজে ঢোকবার অধিকার পেতেন। সংঘের সবাই হতেন ধর্ম ভাই। ছেলেরা সভ্য হবার পর সুবিধে হলে তবে বাইরের লোককে সভ্য করা হত। এভাবে কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই শহরের গিল্ডগুলি থাকত সীমাবদ্ধ। শহরের সংঘে থাকতেন প্রধানতঃ ব্যবসায়ীরা। যে সমস্ত কারিকরের নাগরিক স্বাধীনতা ছিল তাঁরাও তাতে যোগ দিতে পারতেন। গ্রামে প্রথমে ব্যবসায়ী ও কারিকরের মধ্যে তত তফাৎ করা হত না। কিন্তু লোকের হাতে যতই টাকা-কড়ি বাড়তে লাগল ও শহরের লোকসংখ্যাও যখন বৃদ্ধি পেল তখন ধীরে ধীরে আরও বেশি করে তাদের কাজের পার্থক্য

দেখা দেয়। স্বাধীন নাগরিকরা হাতে টাকাকড়ি বেশি পাওয়ায় শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিলেন আর গরীবরা থাকলেন কারিকরী নিয়ে। ব্যবসায়ীদের হাতে ধনসম্পদ যতই বেশি হত ততই তাঁরা শরীর খাটিয়ে কাজ করাকে হেয় মনে করতেন। আলস্য বিলাসের মাত্রা অনুপাতেই সমাজে কে ছোট কে বড় তা ঠিক হত। গরীবরা বড়লোকদের সম্মান না দেখালে তাঁদের মারপিট করলেও বড়লোকদের কোন শাস্তি দেওয়া হত না। এমনি ভাবে বড়লোকদের ব্যবসায়ী সংঘের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। গরীবরা সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কারিকর সংঘগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। অবশেষে ইওরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কারিকর সংঘ আর ব্যবসায়ী সংঘের ভেতর ভীষণ রেষারেষি চলেছিল। মারামারি কাটাকাটিও হয়েছিল অনেক। তবে দলে ভারী বলে কারিকর সংঘগুলিই সাধারণতঃ জয়লাভ করতেন। তাঁদের দাবী ছিল যে আইনের চোখে তাঁদের সঙ্গে বড়লোকদের কোন তফাৎ থাকতে পারবে না। ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপে কারিকরদের দাবী বড়লোকরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কারিকরদের সংঘ প্রথমে গড়ে উঠেছিল শহরের বর্দ্ধিষ্ণু কারিকরদের নিয়ে। পরে ক্রীতদাস আর গরীব সবাই এসে কারিকরদের সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। এসংঘ গুলোকে এখনকার দিনের ধনিক দেশের মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে তুলনা

করলে ভুল হবে। এখনকার ট্রেড ইউনিয়নে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা সর্বহারা মজুরশ্রেণীর লোক। তাঁদের কারুরই জমিজমা বা সহায় সম্পত্তি কিছু থাকে না। শুধু কাজের মজুরীই হচ্ছে সম্বল। কিন্তু সেকালের কারিকরসংঘের সভ্যদের প্রত্যেকরই সামান্য কিছু না কিছু পুঁজি ছিল। তাই নিয়ে তাঁরা নিজেরা খেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখন বড়লোকদের হাতেই রাজত্ব ছিল। গরীব কারিকররা রাজত্ব দখলের কথা ভাবতেন না। সমাজে তাঁদের অবস্থা কি করে ভাল হবে তার দিকেই নজর দিতেন বেশি।

ক্রমে ক্রমে ব্যবসা বানিজ্যের যতই প্রসার হতে লাগল ততই কারিকর সংঘের রূপও গেল বদলে। আগে কারিকর সংঘ ছিল শুধু গরীব কারিকরদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে। এখন কারিকর সংঘের সাহায্য নিয়ে দেশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা খাটাবারও সুযোগ পেলেন তাঁরা। সংঘের সম্পত্তি বেড়ে যাওয়ায় বাইরের লোকেরা নানা উপায়ে এতে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সংঘের বড় লোকেরাও চাইলেন না যে, বাইরের কেউ এসে তাঁদের একচেটিয়া কারবারে ব্যাঘাত জন্মায়। তখন কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে নানা বিধিনিষেধের গণ্ডী তৈরী করলেন। ধীরে ধীরে গরীবদের কারিকরী সংঘ হয়ে দাঁড়ালো ধনিকদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়। বড় হয়ে মার্ক্সীয় অর্থনীতি পড়বার সময় দেখবে যে, কালক্রমে এসব ধনী

কারিকররাই পরের ধনতান্ত্রিক যুগের কলকারখানার মালিকে পরিণত হয়েছিলেন।

বাইরের লোকের পক্ষে নতুন করে সংঘে ঢোকা এত সাংঘাতিক কঠিন ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে কারিকর সংঘ গুলো বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অনেক সময় দেখা গেছে সংঘের ভেতরের ধনীরা গরীবদের সঙ্গে না থেকে নিজেদের নিয়ে আর একটা নতুন সংঘ তৈরী করে ছিলেন। যাঁরা জুতো মেরামত করতেন কিংবা চামড়ার কাজ করতেন তাঁদের সঙ্গে যাঁরা জুতো বানাতেন সেই সব ধনী কারিকররা একসঙ্গে না থেকে পৃথক সংঘ গড়েছিলেন। অন্যান্য কাজেও এমনি করে গরীব আর বড়লোকের ভিন্ন ভিন্ন সংঘ সৃষ্টি হয়।

ইওরোপে যে সমস্ত "গিল্ড" তৈরী হয়েছিল তাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংঘ ছিল নির্দিষ্ট। প্রথমে সংঘের সভাসমিতিতে মেয়েদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। মধ্যযুগের "গিল্ড" সংগঠনের বিশেষত্ব ছিল যে, তাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা উপাস্য দেবতা থাকত। ভারতের পৌরাণিক গ্রন্থে দেখা যায় যে, রাজাকে অনেক সময় এসমস্ত সংঘের উপর নির্ভর করতে হত। সংঘের সাহায্যকে বলা হত "শ্রেণীবল"। "স্মৃতি" গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে চাষী, মহাজন, ব্যবসায়ী, ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্যরা, খেলোয়াড়, কারিকর সবাই নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংঘ

গঠন করতে পারবেন। রাজা সাধারণত এঁদের কোন কাজে হাত দিতেন না। রাজার উপরেও নির্দেশ দেওয়া ছিল যেন তিনি এই সমস্ত সংঘের বিধান মতই প্রজা পালন করেন। বিরোধ বাধলে তখনই কেবল রাজা সংঘের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

"ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে যে তিনজন কিংবা পাঁচজন সভ্যের একটা সমিতির সাহায্যে একজন "মহামাত্য" সংঘ সমূহ পরিচালনা করবেন। মহামাত্য হচ্ছেন রাজার মন্ত্রী।

বুদ্ধের জন্মের পরে (৬০০-৩২১ খৃঃ পূ) সংঘ সমূহের নিজেদেরই আইন রচনা, বিচার ও শাসনের অধিকার ছিল। এ যুগে কারিকরী বিদ্যাও বংশানুক্রমিকভাবে এক এক সংঘে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। শিল্পবিদ্যা ছিল শুধু দু একটি পরিবারেরই একচেটিয়া অধিকার। কারিকরী সংঘের মত ব্যবসায়ী সংঘ এত উন্নত ছিল না তখন।

মৌর্যযুগে (৩২১ খৃঃ পূ—১৮৬ খৃঃ পূ) কারিকরদের ভেতরই অনেক আলাদা সংঘ ছিল। এবং কারিকরদের সংঘগুলিকে রাজা বিশেষ সুবিধা দিতেন। রাজকোষের যিনি হিসাব দেখতেন তাঁর একটি প্রধান কাজই ছিল রাজ্যের সমস্ত রকম সংঘের তালিকা তৈরী করে রাখা। সে সব সংঘের আইন কানুন, আচার ব্যবহার, সব কিছুই তাঁকে জানতে হত।

অন্ধ্র-কুশান যুগে (২০০—৩০০ খৃঃ) রাজ্যে যতরকমের শিল্প কাজ ছিল তার প্রত্যেকটিকে নিয়ে নতুন নতুন বড় সংঘ গড়ে উঠেছিল। দাক্ষিণাত্যে তাঁতি, কবিরাজ, তেলী সবারই সংঘ ছিল।

পরের গুপ্ত যুগে (৩২০-৫০০ খৃঃ) যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বিষ্ণু, প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, দেশ জুড়ে তখন সংঘের অস্তিত্ব ছিল এবং রাজাকেও সেই সব সংঘের দাবী মেনে চলতে হত। সংঘের সভ্যদের বিচারের ভার থাকত পরিচালকদের হাতেই। শুধু তাই নয়। রাজাও এসব সংঘের সাহায্যেই বিচার চালাতেন। সে যুগে তেলী, সিল্ক-তাঁতী ও স্থপতি সংঘেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

তখনকার সংঘের কার্য প্রণালীর বর্ণনা বৃহস্পতির স্মৃতিতে আছে। সংঘ স্থাপনের গোড়ার কথা ছিল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। যজ্ঞ করে, কিংবা লেখাপড়া করে, নয়তো সাক্ষী রেখে তাঁরা কাজ আরম্ভ করতেন। সংঘের পরিচালনার ভার থাকতো একজন সভাপতির উপর। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে দুই, তিন কিংবা পাঁচ জন সভ্যের এক সমিতি থাকত। সচ্চরিত্র,বেদজ্ঞানী, ও সদ্বংশজাত লোকের মধ্যে থেকে এ সমস্ত সমিতির সভ্য নির্বাচিত হতেন। শাস্তি হিসেবে মৃদু তিরস্কার থেকে আরম্ভ করে কোন সভ্যকে তাড়িয়ে দেবার অধিকারও সংঘের পরিচালকদের ছিল। কিন্তু এই পরিচালকশ্রেণী তাই বলে স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। সংঘের সমস্ত

সভ্যদের সাধারণ সভা মাঝে মাঝে এঁদের কাজের আলোচনা করত। তখন যদি পরিচালকদের কাজ পছন্দ না হত তাহলে তাঁদের পদত্যাগ করতে বলা হত। যদি কোন পরিচালক সে নির্দেশ অমান্য করতেন, তখন রাজার সাহায্যে তাঁর শাস্তিবিধান করা হত।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগে (৬০০-৫৪৭ খৃঃ) সমাজে বৈশ্যদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। কৃষি ও গোপালন ছিল আগে বৈশ্যদের প্রধান কাজ। তখন বৈশ্যরা সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। শূদ্রেরা কৃষি কাজে মন দিয়েছিলেন। বৈশ্যরা ব্যস্ত থাকতেন শুধু ব্যবসা নিয়ে। বৈশ্যরা ব্যবসায়ে মন দেবার সঙ্গে সঙ্গে কারিকরদের সঙ্গেও তাঁদের কাজের তফাৎ দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই ব্যবসায়ী ও কারিকর সংঘ দুটি আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অথচ শূদ্র ও বৈশ্য দুই সম্প্রদায়ই আগে এক সঙ্গে অনেক সংঘ গঠন করেছিলেন। সংঘের পরিচালক নির্বাচনের ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যায় যে শূদ্র ও বৈশ্যরা একসঙ্গে থাকতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে টাকা পয়সা বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্যরা ধীরে ধীরে ছোটখাট কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন নিজে বৈশ্য ছিলেন। তাঁর আমলে বৈশ্যরাই ভারত শাসন করতেন। তখন যে সংঘের সভ্যদের হাতে বেশি ধনসম্পদ থাকত সমাজে তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি হত বেশি। এমনি ভাবে সংঘগুলোর ভেতরেও ছোট

বড়ো নানা ভাগ দেখা দিয়েছিল। এখনো ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় তার রেশ আছে। প্রাচীন কালে যাঁরা মদ তৈরী করতেন ও যাঁরা মদ বিক্রী করতেন তাঁরা সকলে একই সংঘে থাকতেন। এখন পাঞ্জাব অঞ্চলে এঁদের দুটি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ আলাদা জাতে পরিণত হয়েছে। এমনি করেই বাংলায় মুচি (জুতো সেলাই করেন যাঁরা) আর ঋষি (যাঁরা চামড়ার কাজ করেন) আলাদা হয়ে গেছে। চাষী কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত ও এক নন। আগে যাঁরা তেল বিক্রী করতেন তাঁদের হাতে অগাধ পয়সাকড়ি হওয়ায় তাঁরা নিজেদের নাম বদলে তেলী থেকে তিলিতে পরিণত হয়েছেন। আর সে যুগে যাঁরা তেল তৈরী করতেন সেই 'কলু'রাই রয়ে গেলেন সত্যিকারের তেলি।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের একতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নানা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল তখন ভারতবর্ষে। তাদের মধ্যে ক্রমাগত অশান্তি লেগেই থাকত। তখনই ভারতে বৌদ্ধধর্মের বদলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রধান হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তা'বলে ভারতে সংঘ প্রথা লোপ পায় নি। এমনকি দ্বাদশ শতাব্দীতেও সংঘের উল্লেখ দেখা যায়।

মুসলমান আক্রমণের পর থেকে আমরা ভারতে সংঘের অস্তিত্বের আর সন্ধান পাই না। তখন থেকে সমাজে এক নতুন জিনিস দেখা দেয়। সেটাই হ'ল এখনকার

'জাত'। সংঘের উল্লেখ এখন পাওয়া যেত না বটে, কিন্তু সংঘের পরিচালক শ্রেণীর মতই একটি সমিতির কথার উল্লেখ আছে অনেক। তাকে বলা হত জাতের "পঞ্চায়েত।" জাতের ভেতরে নানা বিধি নিষেধ, আইন কানুনও প্রচলিত ছিল ঠিক আগের যুগের সংঘের মত। কিছুদিন আগেও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের (তাঁতি) মধ্যে একজন করে "চাঁই" থাকতেন। তিনিই ছিলেন আগের যুগের সংঘের সভাপতির মত জাতের কর্তা। তাঁর কথা মত সবাইকে চলতে হত।

বৃটিশ রাজত্বের আমলে ভারতে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আগে প্রত্যেক সংঘের পৃথক পৃথক দেবতা ছিল। এখনো হিন্দুদের মধ্যে সে প্রথা দেখা যায়। বাংলার গন্ধবণিকরা এখনো গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা করেন, এবং কায়স্থরা চিত্রগুপ্তের পূজা করেন, কর্মকারদের ধারণা যে তাঁরা বিশ্বকর্মার বংশধর। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে স্বর্গের স্থপতি বিশ্বকর্মার নয় ছেলে ছিল। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে মালাকর, কর্মকার, কংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর। পরে স্বর্ণকার, কর্মকার ও চিত্রকর দেবতার শাপে সমাজে অধঃপতিত হয়ে ছিলেন। এ উপাখ্যান থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তখনকার দিনে কারিকররা ঐ কটি বিভিন্ন সংঘে বিভক্ত ছিলেন।

সংঘ সংগঠনের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি যে, দাক্ষিণাত্যে আর এক ধরনের সংঘ ছিল। দাক্ষিণাত্যে শহর-

সমিতি, গ্রাম্য সমিতি ও ব্যবসায়ী সংঘের উল্লেখ পাওয়া যায় নানা শিলা লিপিতে। অনেক সময় বিশাল গ্রাম্য সমিতি আবার ছোট ছোট নানা উপ-সমিতিতে বিভক্ত থাকত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধবংশীয় রাজা প্রথম পরন্তক একটি গ্রাম্য সমিতির নানা উপসমিতির উল্লেখ করেছেন। উদ্যান, প্রান্তর, পুষ্করিণী প্রভৃতির জন্যও ভিন্ন ভিন্ন সমিতি ছিল। অন্য একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, গ্রাম্য সমিতিগুলি গ্রামের স্বার্থে কোনও কাজ করলে সমিতির সভ্যরা প্রত্যেক তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকতেন। দেবমন্দির চালাবার জন্যে মন্দির সমিতিও থাকত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কেরল দেশের মন্দির পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ভাবে "যোগম" বা মন্দির সমিতির হাতে ছিল।

এ ছাড়া নানা ব্যবসায়ী সংঘেরও কথা আছে সে সমস্ত শিলালিপিতে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেও "মণি" গ্রামে ব্যবসায়ী সংঘের এক জন সভ্যকে 'মনিগ্রামম্' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। মজার কথা হচ্ছে যে, তিনি জাতিতে ছিলেন খৃষ্টান। তেমনি আর একজন ইহুদী জোসেফ রাব্বনকে কে "অঞ্জুভান্নম" উপাধি দেওয়া হয়েছিল'। শিলালিপি বিশেষজ্ঞরা এ সমস্ত প্রমাণ থেকে বের করেছেন যে, তখনো দক্ষিণ ভারতে "মনি" ও "অঞ্জু" (Anju) নামে অর্দ্ধ স্বাধীন ব্যবসায়ী সংঘ প্রচলিত ছিল। সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের বহু কানাড়ী ও তামিল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ব্যবসায়

সংঘ তখন সে দেশে বেশ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বলেই পরিগণিত হত। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, সে সমস্ত সংঘের মধ্যে খৃষ্টান ও ইহুদীকেও সভ্য করতে আটকায়নি। সংঘগুলির ভেতর এত নানা জাতির সংমিশ্রন হওয়ায় সেদেশে সংঘগুলি বিভিন্ন জাতে পরিণত হবার অবকাশ পায় নি।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালকাপুরম শিলালিপি থেকে জানা যায় কি করে গ্রামগুলির শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। কাকাতিয় রাজা গণপতিদেব ও রাজকন্যা রুদ্রম্বা তাঁদের গুরুদেব বিশ্বেশ্বর শিবের নামে দুটি গ্রাম উৎসর্গ করেছিলেন। গুরুদেব সে দুটি গ্রামকে এক করে একটি "অগ্রহার" বা দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিণত করেছিলেন। তাই তিনি সে গ্রামে একটি সাধুদের মঠ, জনসাধারণের খাবার জায়গা, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন ও সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। গ্রামে থাকতেন একজন চিকিৎসক, হিসাব লেখবার জন্য ছিলেন কায়স্থ, মঠ ও ভোজনাগারের জন্য ছয়জন ব্রাহ্মণ। গ্রাম রক্ষার জন্য ও শান্তিস্থাপনের জন্য দশজন ভৈরব নিযুক্ত হতেন। পিওনের কাজ করার জন্য আরও কুড়িজন লোক থাকতেন সেই গ্রামে। এছাড়া টুকিটাকী কাজকর্মের জন্য দশজন কারিকরও থাকতেন। গুরুদেব বিশ্বেশ্বর শিবের হাতে থাকত গ্রামের প্রত্যেকটি ব্যাপার পরিচালনার ভার।

শুধু দাক্ষিণাত্যে নয় বাংলাতেও পালরাজবংশের পর চন্দ্র

ও সেন রাজবংশের শিলালিপিতে "মহাগণস্থ" নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের ধারণা গ্রামের বা শহরের সংঘের শাসন-কর্তাকেই তখন 'মহাগণস্থ' বলা হত। এথেকে বেশ বোঝা যায় হিন্দুরাজত্বের শেষ দিন অবধি বাংলার গ্রামে বা শহরে সংঘ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ভারতের সংঘব্যবস্থার উঠাপড়ার ইতিহাস আলেচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রথমে একই কাজ করত এমন সবাইকে নিয়ে এক একটি সংঘ গড়ে উঠেছিল। পরে কারিকরী বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংঘ ভেঙে দু তিন ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তখন সংঘ গুলিতে প্রচলিত হয়েছিল বংশানুক্রমিক রীতি। কয়েকটি পরিবার নিজেদের মধ্যেই সংঘের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখে বাইরের সব প্রভাব থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। যতদিন যেতো ততই এসমস্ত বংশানুক্রমিক সংঘগুলিতে খাওয়া, শোওয়া, বিয়ে করার নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রচলিত ছুঁৎমার্গ নীতির (Taboo) মত আরও অনেক বিধিনিষেধ সেই সব সংঘে ঢুকে পড়েছিল। তারও পরে সেই সমস্ত সীমাবদ্ধ সংঘগুলি হয়েছে আজকের নানা জাতে রূপান্তরিত। খুব সম্ভবত মুসলমান ও অন্যান্য নানা বৈদেশিক আক্রমণকারীরা ভারত জয় করে ঐ সমস্ত স্ব স্ব প্রধান সংঘগুলির হাত থেকে শাসন, বিচার প্রভৃতি রাজনীতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক

ক্ষমতা না থাকায় যে টুকু সামাজিক অধিকার তাঁদের ছিল তাই বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সংঘগুলি আরও কঠোর ভাবে বিধি নিষেধের গণ্ডী কেটে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখত। এক সংঘের লোকের সঙ্গে অন্য সংঘের কোন সম্বন্ধই থাকত না। সংঘের বাইরে ওঠাবসা কি বিয়ে করাই ছিল বারণ। কালক্রমে এই সংঘ থেকেই আজকের এত হাজার জাত গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে।

বিভিন্ন যুগের জাতিভেদ প্রথার তারতম্য

ভারতে জাতিভেদ প্রথার গোড়ার কথা এর আগে বলা হয়েছে। তাথেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে, বিভিন্ন যুগে জাতিভেদ প্রথার রূপও বদলিয়ে ছিল। আজকের মত ছুৎমার্গ প্রথা প্রথমটাতে মোটেই ছিল না। যুগ যুগান্তরের পরিবর্তন ও সমাজে ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বর্তমান ভারতের হিন্দুদের মধ্যে বীভৎস অস্পৃশ্যতার সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে। এক এক যুগের মানুষের অবস্থা ছিল এক এক রকম। তাদের মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধও তেমনি ভাবেই গড়ে ওঠে। নানা যুগের জাতিভেদ প্রথার আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব কি করে এ প্রথাটির রূপ বদলিয়েছে।

বৈদিক যুগ

প্রথমে বৈদিক যুগের কথাই নেওয়া থাক। বৈদিক যুগে আর্যরা যাযাবরের মত দেশ দেশান্তরে ঘুরতেন। এক জায়গাতে স্থির হয়ে থাকা তাঁদের কোষ্ঠীতে লেখেনি। তখন এদিক ওদিকে ছিটকে পড়া এক একটি দলের সবাই এক সঙ্গে চলাফেরা করত। একসঙ্গে থাকতে গেলেই জীবনধারণের জন্য হরেক রকমের কাজ করতে হত

তাঁদের। সেজন্য বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে নিজের নিজের কাজ অনুপাতে বিভিন্ন জাতির নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ একে অন্যের অস্পৃশ্য ছিলেন না। সেই যুগে রাজা ঋষ্টিসেনার দুই ছেলে ছিলেন। একজন দেবপী অন্যজন শান্তনু। এঁদের দুজনের বংশধরের একদল ছিলেন ক্ষত্রিয় আর একদল ব্রাহ্মণ। মহাভারতে এঁদের অনেক গল্প আছে।

ছোট বড় অনেকগুলো কুল নিয়েই ছিল তখনকার আর্যদের সমাজ। সেইসব কুলের প্রত্যেক রাজাকে ঘিরে থাকতেন একদল চারণ। রাজারাজড়ার কীর্তিকাহিনী কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়ে রাজাকে শোনানোই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। এঁদেরই বলা হত "ব্রাহ্মণ"। ব্রাহ্মণ কথাটির অর্থ আবার চিরদিন এক ছিল না। প্রথমে ঋষি অর্থে ব্রাহ্মণকে বোঝাতো। পরে কবি, ও আরও পরে ব্রাহ্মণ বলতে বোঝাতো পুরোহিতকে। চারণ কবির কাজ যতই বেশি হল, রাজাও ততই চারণ ছাড়া এক পাও নড়তে পারতেন না। ক্রমে ব্রাহ্মণরা প্রচার করতে লাগলেন যে, কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণ পুরোহিত না থাকলে দেবতারা সে যজ্ঞের কোনও ফল দেন না। তাঁরা আরও বললেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত দেবতাদেরও আলাদা আলাদা শ্রেণীবিভাগ আছে। যদি কেউ কোন দেবতাকে তুষ্ট করতে চান তো তাঁকে নিজের কুলের দেবতারই আরাধনা করতে হবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুদল যখন সমাজে প্রধান হয়ে

উঠেছিলেন তখন বেচারা বৈশ্যদের অবস্থা ছিল খুব কাহিল। এতদিন বৈশ্যরা চাষবাস, পশুপালন ও অন্যান্য নানা উপায়ে জীবন যাপন করছিলেন। এবার সমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি গেল কমে। তাঁদের অবস্থা তখন এত হেয় হয়েছিল যে অনেক সময় তঁদের শূদ্রদের সঙ্গে এক পর্যায় ফেলা হত। শূদ্রদের উপরে প্রথম থেকেই নানা বিধি নিষেধের চাপ তো ছিলই। তাঁরা পূজা আর্চনা কিছু করতে পারতেন না।

সমাজের মধ্যে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকলেও তখন কিন্তু একজাতের লোক অন্য জাতিতে উঠ্‌তে পারতেন। কোন জাতটাই তখনো বংশপরম্পরাগত ছিল না বলে কাজ অনুসারেই লোকের জাত ঠিক হত।

দিন যাবার সঙ্গে ব্রাহ্মণরা নিজেদের দাবী বাড়িয়েছিলেন। অর্চনা, দান, অজেয়তা ও অবধ্যতা—এই চারটি ছিল তাঁদের দাবী। অর্থাৎ সমাজের অন্য সবাই তাঁদের অর্চনা, ভক্তি আর দান করবে। কেউ তাঁদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এমন কি রাজাও তাদের ফাঁসীর হুকুম দিতে পারবেন না। এই সব দাবী থেকেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেণী সংঘর্ষ হয়েছিল।

যতই বৈদিক যুগ শেষ হয়ে আসছিল ততই ব্রাহ্মণরা নিজেদের দাবী বংশপরম্পরাগত করে নিচ্ছিলেন। বাইরের কাউকে তাঁরা আর নিজেদের ভেতর নিতে চাইতেন না। ব্রাহ্মণের ছেলে না হলেই অন্যদের তাঁরা ঠাট্টা তামাসা করতেন।

ঐলুষকবশ ছিলেন দাসীর ছেলে। আর নিজে তিনি দ্যূতক্রীড়া করতেন। তাই তাঁকে ব্রাহ্মণরা প্রথম প্রথম উপহাস করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর ইন্দ্রজালিক শক্তি দেখে ব্রাহ্মণরা শেষে তাকে সম্মান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসব দেখেই ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ব্রাহ্মণদের বলেন "পুরোহিত সংঘ।"

সে যুগে ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্য যে কোন শ্রেণীতে বিয়ে করতে পারতেন। ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য শ্রেণীর মেয়ে বিয়েতে বাধা ছিল না। বৈশ্যরা শূদ্রদের মেয়ে বিয়ে করলে দোষ হত না। কিন্তু শূদ্রের বিয়ে করতে হত নিজেদের মধ্যেই। এভাবে উচ্চশ্রেণীর লোক নিচুশ্রেণীর মেয়ে বিয়ে করলে তাকে বলা হয় 'অনুলোম' বিবাহ। মুসলমান আক্রমণের আগে পর্যন্ত অনুলোম বিবাহ ভারতে প্রচলিত ছিল। উঁচু জাতের পুরুষই যে শুধু নিচের জাতের মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন তা নয়। বেদে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের মেয়েও বিয়ে করেছেন। শূদ্রদের সঙ্গেই একমাত্র অন্য উঁচু জাতের মেয়ের বিয়ের কথা প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

খাওয়ার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না তখনো। নিচু জাতের হাত থেকে খাবার খেলেই কারুর জাত যেত না। একসঙ্গে সবাই মিলে খেতে পারতেন।

বেদের পরে

ভারতের ইতিহাসে বেদের পরের যুগ একটি প্রধান স্থান দখল করে আছে। এ যুগেই ভারতের সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। সেই ভাঙাগড়ার ভেতরেই বৈদিক যুগের পরের ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছিল।

এ যুগের আরম্ভেই দেখতে পাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ! বেদেই তার বিবরণ আছে। রাজা বীনা তাঁর রাজ্যের ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনা সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন; মহারাজ নহুষ একহাজার ব্রাহ্মণ দিয়ে তাঁর রথ টানাতেন এবং এরই জের চলে এসেছিল রামায়ণের পরশুরামের কাহিনী পর্যন্ত। ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজের তখন টলটলায়মান অবস্থা! শতরুদ্রীয় স্তোত্রগুলিতেই এ সব সংঘর্ষের বর্ণনা আছে।

একদিকে যেমন রাজন্য ও পুরোহিতদের মধ্যে সমাজে প্রাধান্যের জন্যে শ্রেণী সংগ্রাম চলছিল অন্য দিকে আবার তেমনি প্রচলিত বৈদিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধেও নানা মতবাদ দেখা দিয়েছিল। "সাংখ্য দর্শন" তার মধ্যে প্রধান। কপিল মুনিই সাংখ্য দর্শনের স্রষ্টা! তিনি জোর গলায় বললেন, যিনি যেমন কাজ করবেন সমাজে তাঁর স্থান হবে ঠিক তেমনি। ভালকাজ করলে লোকে শ্রদ্ধা করবে, তা নয়তো

করবে না। উঁচুবংশে জন্ম বলেই কেউ জোর করে সমাজের সবাইকার শ্রদ্ধা আদায় করতে পারে না।

কপিল মুনির মত আরও নানা জৈন তীর্থঙ্কর ও অহিংসার প্রচারক তখন নিজের নিজের মত প্রচারের জন্য সারা ভারত ঘুরে বেড়াতেন। এ যুগের শেষ হয় গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সঙ্গে।

এ সময়েই সাহিত্যে "অনার্য" শব্দটির প্রচলন হয়েছিল। যাস্ক-ই প্রথম কিকাতদেশের লোককে অনার্য বলেছিলেন। সে কথা আগেই পেয়েছো। সে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শো কি পাঁচশো বছর আগের কথা। তখন কিকাত দেশ বলতে মগধ বোঝাত। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, তখন বুঝি সত্যি মগধে একদল অসভ্য লোক থাকতেন। তাঁদেরই বোধহয় অনার্য বলা হয়েছিল। কিন্তু বহু পণ্ডিত আবার অন্য কথা বলেন। ডাঃ দত্ত দেখিয়েছেন যে, যাস্কের সমসাময়িক ছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি মগধে নিজের মত প্রচার করতেন। কিন্তু কোন বৌদ্ধ সাহিত্য কি সংস্কৃত সাহিত্যেই পাওয়া যায় না যে, বুদ্ধদেব অসভ্যদের মধ্যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। আবার মগধের পাশেই ছিল বিদেহ রাজ্য। রাজর্ষি জনক ছিলেন সে দেশের রাজা। তাঁর সভায় ছিলেন পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁরা কিন্তু বেদেরই অনুশাসন মেনে চলতেন।

তাছাড়া সায়ণাচার্য নামে আর একজন সে যুগের পণ্ডিত

কিকাত দেশকে বলতেন 'নাস্তিক' এবং 'মগধের' নামের অর্থ করেন "সুদখোর মহাজন"। ডাঃ দত্ত মনে করেন যে, মগধের লোক বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে বেদের অনুশাসন না মানায় তাঁদের ব্রাহ্মণরা অনার্য বলতেন। তাঁর মতে অনার্যের অর্থ অদীক্ষিত। এদিকে বৌদ্ধরাও নিজেদের বলতেন আর্য। তখন বেদ ও নতুন বৌদ্ধ সভ্যতার মধ্যে বাধল সংঘর্ষ।

এ সময়ের সমাজের বর্ণনা রামায়ণে আছে যে, অনেক ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জনের জন্য লাঙ্গল ধরে চাষ করতেন। পরের যুগের মহাভারতে আবার এর উল্টো কথা আছে। তাতে স্পষ্ট করেই শ্রেণী বিভেদের উল্লেখ আছে—ব্রাহ্মণ ভিক্ষার অন্নে প্রাণ ধারণ করবে, ক্ষত্রিয় করবে প্রজাপালন, বৈশ্যের কর্তব্য হচ্ছে বানিজ্য আর শূদ্রের কর্তব্য অন্য তিন শ্রেণীর সেবা। কোন উঁচু বর্ণের লোক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য তাঁদের নিজেদের কাজ না করলেই শূদ্রে পরিণত হবেন। বংশপরম্পরাগত জাতি ব্যবস্থা দেখে অনেকে মনে করেন যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রাহ্মণদের পুনরুত্থানের সময় ঐ সমস্ত বিষয় মহাভারতে স্থান পেয়েছিল।

রামায়ণ আর মহাভারত এদুটি এছাড়াও ছিল নানা ধর্মশাস্ত্র। সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের মতামতই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্র রূপে প্রচারিত হয়েছে। আজও হিন্দুরা সেই সব

ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলেন। ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে গৌতম, আপস্তম্ভ, ও বৌধায়ণই সবচেয়ে প্রাচীন। পণ্ডিত পি, বি, কানে'র মতে এ তিনটি ধর্ম গ্রন্থ খ্রীঃ পূর্ব ৬০০—৩০০ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। আগের চেয়ে এ ধর্মগ্রন্থগুলো অনেক বেশি গোঁড়া।

এদের মধ্যে গৌতম ও বৌধায়ণ গ্রন্থে অনেক বিভিন্ন মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু পণ্ডিত আপস্তম্ভই প্রথম ছুৎমার্গের প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মশাস্ত্রে বিধান আছে যে, শূদ্রের রান্না অন্য কেউ খেতে পারবে না। যাস্কের যুগে কিংবা বেদের যুগে এত কঠিন বিধিনিষেধের গণ্ডী ছিল না। যাস্কের পর থেকেই ব্রাহ্মণদের আলাদা থাকবার ও নিচুস্তরের লোকের সঙ্গে বিয়ে কি অন্য কাজ কারবার করা নিষিদ্ধ হ'তে থাকে। তবে তখনো সবাই আপস্তম্ভের সঙ্গে একমত ছিলেন না। গৌতম বরাবর বলেছিলেন যে, যদি কেউ অন্য কোনও উপায়ে জীবিকা ধারণের উপযুক্ত অন্ন সংস্থান না করতে পারেন তবে তিনি অনায়াসে শূদ্রের অন্নও খেতে পারেন।

এতো গেল খাবার কথা। বিয়ের ব্যাপারেও আবার সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। বৌধায়ণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিয়েতে কোন আপত্তি করেন নি। গৌতম আবার বলেন যে, হীনজাতের লোক উচ্চশ্রেণীর মেয়ে বিয়ে করলে তাঁদের সন্তানদের কোন পূজা অর্চনার

অধিকার থাকবে না। শুধু তাই নয়। তিনি আরও বলেন যে, যে কোন শ্রেণীর লোকেরই যদি একমাত্র স্ত্রী জাতিতে শূদ্রা হন তাহলে তাঁকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে না।

গ্রীস, রোম ও অন্যান্য দেশেও এমনি নিচুশ্রেণীর লোক উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন না!

গৌতমই প্রথম শাস্তির তারতম্য করে লঘুপাপে শূদ্রদের গুরু দণ্ডের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর মতে কোন বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন তবে তাঁকে আড়াইশো 'পন' জরিমানা দিতে হবে; অথচ কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তাঁকে দিতে হবে মাত্র পঞ্চাশ পন জরিমানা। বৈশ্যের ক্ষেত্রে সে জরিমানা হবে অর্দ্ধেক। আর শূদ্রকে অপমান করলে ব্রাহ্মণের কোনও শাস্তি হবে না।

সমাজে শ্রেণীভেদের সঙ্গে সঙ্গে নিচুজাতের উপর অত্যাচার বাড়ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় এযুগেই সমাজে প্রথম টাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। আগের দিনে গরু দিয়ে সব জিনিসের দাম ধরা হত। এখন আর তা হত না। ঐসব ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সমাজের জীব বলে ব্রাহ্মণদের দাবীর কথা পরিষ্কার করে উঠেছে।

ব্রাহ্মণদের এই দাবী কিন্তু তখনকার সমাজে সব শ্রেণীর লোকই

নির্বিবাদে মেনে নেন নি। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকাররাই এবিষয়ে প্রধান। মধুরসুত্ততে আছে যে, ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের কোন ন্যায্য দাবী নেই। অতীতেও কোনও দিন এমন ছিল না। গুণানুসারেই মানুষের জাতির তফাৎ হতে পারে জাত অনুসারে নয়।

সে সূত্তেই আর একটি কথা আছে। মহাকচ্ছনা বলছেন যে, সমাজের কারুরই কোন বাঁধা-ধরা কাজের নিয়ম নেই। যে কোন জাতের লোকেরই যদি বেশি ঐশ্বর্য্য থাকে, তবে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবাইকেই নিজের অধীন চাকরীতে নিযুক্ত করতে পারেন। তাঁরাও অম্লান বদনে প্রভূর সেবা করে ধন্য হবেন।

এথেকে বোঝা যায় যে অব্রাহ্মণরাও তখন ব্রাহ্মণকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। গৌতমের ধর্মশাস্ত্রের বিধানের বিপক্ষে গেল এই সব রীতি।

বুদ্ধ বলেছিলেন যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায় কিংবা একজন মানুষের সঙ্গে আর একজনের তুলনা করলে দেখবে যে ক্ষত্রিয়রাই ব্রাহ্মণদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গভীর বিপাকে ও জঘন্য হীনাবস্থায় পড়লেও ক্ষত্রিয়দের আসন ব্রাহ্মণদের চেয়ে উঁচুতেই থাকবে।

বৌদ্ধগ্রন্থে সব সময় বলা হয় যে, ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ব্রাহ্মণরা আসেন তার পরে। এবিষয়ে জৈনগ্রন্থও বৌদ্ধদের সঙ্গে একমত।

বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে দেখা যায় যে, তখন সমাজে অসবর্ণ বিয়ের প্রচলন ছিল। কুম্মসপিণ্ড-জাতকে আছে শ্রাবস্তী নগরের প্রধান মালাকরের মেয়েকে কোশলরাজ বিয়ে করে পাটরাণী করেছিলেন। মাতঙ্গ-জাতকে আছে যে, এক ধনীর মেয়ে বিয়ে করেছিলেন চণ্ডালকে। উঁচু জাতের পুরুষও যেমন নিচু জাতের মেয়ে বিয়ে করতেন তেমনি নিচু জাতের পুরুষও উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করলে কেউ কিছু বলত না।

বৈদিক যুগে 'মঘবা' বলে একটি ধনী সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল। শাসকশ্রেণী বলে ক্ষত্রিয়রাও নিজেদের নিয়ে এক আলাদা সম্প্রদায় তৈরী করেছিলেন। এ ছাড়া ধনী বৈশ্য ও শূদ্রেরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন হয়েছিল ভারতেও ছিল তাই। এঁরা সবাই নিজেদের অধিকার বজায় রাখবার জন্যে অন্য শ্রেণীর সঙ্গে পার্থক্য বজায় রেখে চলতেন।

এভাবে পৃথক থাকবার চেষ্টা থেকেই পরের যুগের অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নানা বিধিনিষেধ সমাজে ঢুকেছিল।

মৌর্যযুগ

বৈদিক যুগের পরে আমরা দেখেছি যে, ভারতে নানা ধরনের চিন্তাধারা ও ধর্মমতের প্রচার হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বেদের যুগের শেষ হয়েছে। সেই যবন আক্রমণের ফলে ভারত

দেশ-বিদেশের রাজনীতির ডামাডোলে পড়েছিল। তারই ফলে এসেছিল এক নতুন যুগ। আগের কোন যুগের সঙ্গেই তার তেমন সামঞ্জস্য নেই।

আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করলে যে সব ভারতীয়রা তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'পুরুই' ছিলেন প্রধান। বৈদিক সাহিত্যে পুরুর বীরত্বের বহু উল্লেখ আছে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার যতই ভারতের পূর্বাঞ্চল-বিজয়ে এগোচ্ছিলেন ততই তাঁর কানে গুজব আসতে থাকে যে, এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বঙ্গ ও মগধের প্রাসই রাজ তাঁকে বাধা দিতে আসছেন। এঁরা ছিলেন নন্দবংশের। মহাপদ্মনন্দ এই রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন। পুরাণে তাঁকে শূদ্র বলা হয়েছে। মগধের শেষ ক্ষত্রিয় রাজবংশ শৈশুনাগ বংশের জারজ সন্তান ছিলেন তিনি। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম শূদ্র রাজার নাম পাওয়া যায়।

শূদ্রবংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের আগের গৌরব নষ্ট হয়ে গেল। তার ফলে ভারতে এক নতুন রাজন্য শ্রেণী সৃষ্টি হ'ল। পুরাণেও আছে যে, নন্দবংশীয় শূদ্ররাজা ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজবংশ ধ্বংস করে কৈবর্ত, পঞ্চক প্রভৃতি নিচু জাতের লোক নিয়ে নতুন রাজবংশ তৈরী করবেন।

ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করলেও ব্রাহ্মণদের সমাজ ব্যবস্থার বিপক্ষে তাঁরা তেমন কোন অভিযান করেন নি। সামাজিক বিপ্লব হয়েছিল আরও পরে। মৌর্য যুগে কৌটিল্যের

'অর্থশাস্ত্র' রচিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে যে, রাজার আইন ধর্মের অনুশাসনের চেয়েও বড়। তখনকার প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে কৌটিল্য সমাজে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করেন। শূদ্রদের সবাইকেই তিনি "আর্য" বলেন। আর্য বলতে তখন মুক্ত নাগরিক বোঝাতো। মৌর্যযুগে সমাজ থেকে প্রথম দাসব্যবস্থা লোপ পেয়েছিল। কৌটিল্য বিধান দেন যে, পুরোহিতরা শূদ্রদের যজ্ঞেও পৌরোহিত্য করতে পারেন। তাঁর অর্থশাস্ত্র শূদ্রদের এমনি নানা সুবিধা দিয়েছিল। কিন্তু তাবলে কৌটিল্য একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁদের পক্ষে রায় দেননি। 'অর্থশাস্ত্রে' অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদের দিকে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। সমাজে উচ্চ শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রেখে তিনি শূদ্রদের কতকগুলো বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছিলেন মাত্র। নিচুশ্রেণীর পুরুষ উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে বিয়ে করলে কৌটিল্যের মতে সে বিয়ের সন্তান মা-এর জাত পেতেন না। আবার বৈশ্যরা শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করলে তাঁদের সন্তান হ'ত শূদ্র! এ বিধানগুলো শূদ্রদের দাবিয়ে রাখার জন্যেই রচিত হয়েছিল।

তবে আগের কোন যুগে শূদ্রকে রাজকাজে কোর্ট কাছারিতে সাক্ষী দিতে দেওয়া হ'ত না। কৌটিল্য তাঁদের সে অধিকার দেন। ক্রীতদাসের বংশে না জন্মালে নতুন করে আর কেউ কোন শূদ্র দাস কেনাবেচা বা বন্ধক রাখতে পারতেন না। তাহলে অপরাধীর বারো 'পণ' জরিমানা হ'ত।

এছাড়া কেউ যদি ক্রীতদাসদের টাকা ঠকিয়ে নিতেন কিংবা তাঁদের অধিকারে হাত দিতেন তাহলেও সেই অপরাধীর জরিমানা দিতে হ'ত। ক্রীতদাসের সন্তান হ'লেই কেউ ক্রীতদাস হ'ত না। তাঁর ছেলেকেও আর্য বলা হ'ত।

এর আগে পৃথিবীর কোন দেশেই এত বড় সামাজিক বিপ্লব হয় নি। ক্রীতদাসের ছেলে সবদেশেই ক্রীতদাস হয়। এই প্রথম শোনা গেল যে, ক্রীতদাসের ছেলেও হ'তে পারেন 'আর্য'। এই সব নয়। যে কোন ক্রীতদাসই আবার প্রভুকে টাকা শোধ করে দিলেই মুক্ত হ'তে পারতেন।

শাস্তির বিষয়ে কিন্তু কৌটিল্য উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। একই দোষের জন্য উঁচু শ্রেণীর লোককে তিনি কম শাস্তির বিধান দিয়েছেন। এটুকু শুনেই তোমরা হয়ত ভাবছ, বারে, তা হলে চন্দ্রগুপ্ত কেমন বিপ্লবী ছিলেন! একথা ভুলো না যে, সমাজে এই প্রথম ব্রাহ্মণদেরও শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং তাদের ফাঁসী দেবারও অধিকার দেওয়া হয় রাজাকে। এটা তখনকার সমাজে কম বিপ্লব নয়।

মহামতি অশোকের রাজত্বে ব্রাহ্মণদের অন্যান্য অবশিষ্ট সুযোগ সুবিধাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনি পশুবলি বন্ধ করে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান করেন। পুরুতগিরি তুলে দিয়ে নিজের অধীনে ধর্ম-মহামাত্য নিয়োগ করে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যেন রাজ্যের প্রজাসাধারণ আদর্শ জীবন যাপন করতে

পারেন। তার ফলে ব্রাহ্মণদের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। এবার একই অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন শাস্তি হ'ত না। আইনের চোখে সকলেই সমান বলে পরিগণিত হতেন। ব্রাহ্মণরা এই ভাবে সব ক্ষমতা হারিয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরছিলেন। তখনই দেখা দিয়েছিল ভীষণ শ্রেণী সংগ্রাম।

ব্রাহ্মণদের বিপ্লব-বিরোধিতা

শূদ্রদের হাতে অপমানের শোধ নেবার জন্য ব্রাহ্মণরা নিস্‌পিস্‌ করছিলেন। তখন ১৮৪ খৃঃ পূঃ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ ভারতে ব্রাহ্মণ রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। এতদিন পরে প্রথম ব্রাহ্মণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল দেশে। ইতিহাসে আছে যে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বিজয় উৎসব করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য 'মঞ্জুশ্রীমুলকল্পে' আছে তিনি বিজয় উৎসবে বৌদ্ধ বিহারের সব জ্ঞানী গুণাদের ধরে এনে হত্যা করেছিলেন।

এযুগের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে মনুর ধর্মশাস্ত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জনসাধারণকে যা কিছু সুযোগ· সুবিধা দেওয়া হয়েছিল ধর্মশাস্ত্রে তা সব কেড়ে নেওয়া হয়। ঐতিহাসিক জয়শোয়াল মনে করেন যে, তখনকার সম্রাট মনুর ধর্মশাস্ত্র মতে রাজ্য শাসন করতেন বলেই এত তাড়াতাড়ি সেই নীতি ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিশেষ দরকার হলে যে রাজাকেও হত্যা করা যায় তার নির্দেশ আছে গ্রন্থটিতে। এর আদ্যোপান্ত শূদ্র-বিদ্বেষে ভরা। স্পষ্ট বলা আছে যে, কোন ব্রাহ্মণ যেন ভুলেও শূদ্রের রাজত্বে বাস না করেন। শূদ্রের বিচারক হবার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শূদ্রকন্যা বিয়ে করাও নিষেধ ছিল। সমাজে দাস ব্যবস্থা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় ও নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দাসের সন্তানরা প্রভুরই সম্পত্তি। উঁচুশ্রেণীর লোকের জন্য আবার কম শাস্তির প্রচলন হল। বইটিতে শূদ্রদের যে কত রকমের শাস্তি বিধান করা আছে তার ইয়ত্তা নেই। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে অপমান করলে তাঁর জিব কেটে ফেলা হত। ব্রাহ্মণকে গালাগালি করলে শূদ্রের মুখের মধ্যে দশ আঙুল লম্বা পেরেক গেঁথে দেওয়া হত। যে শূদ্র ব্রাহ্মণদের নীতি শিক্ষা দিতে আসতেন তাঁর মুখে আর কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হ'ত। শূদ্র তার যে অঙ্গ দিয়ে ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য উঁচু শ্রেণীর লোকের অপমান করতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই অঙ্গ কেটে ফেলা হ'ত। এক জাতের উপর অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা যে কতদূর হ'তে পারে এ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁরা টাকা ধার করলেও তার সুদ দিতে হ'ত অন্য সব শ্রেণীর চেয়ে বেশি। ব্রহ্মহত্যা ভীষণ পাপ বলে বিধান দেওয়া ছিল। ধর্মশাস্ত্রে আছে যে, ব্রাহ্মণ খুব জঘন্য অপরাধ করলেও তাঁকে ফাঁসী না দিয়ে রাজা যেন নির্বাসন

দেন। নির্বাসিত হলেও সম্পত্তি তাঁরই সঙ্গে থাকত এবং তাঁর কোনও শারীরিক অসুবিধা না হয় সেদিকেও রাজাকে দৃষ্টি রাখতে হত।

অসবর্ণ বিয়েতে তিনি আপত্তি করেন নি, তবে তাঁর মতে নিচু জাতের মেয়ে বিয়ে করলে সন্তানরা পিতার জাতে উঠতে পেতেন না।

রাজার উপর নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন ভুলেও ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন না হন। কারণ ব্রাহ্মণরা ইচ্ছে করলেই তাঁর রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারেন। মন্ত্রী নির্বাচনের সময় রাজা যেন বেদ ও নানা শাস্ত্রজ্ঞানীদের মধ্য থেকে লোক নেন। তাঁরই সময়ে 'নরদেবতা' শব্দটির উদ্ভব। রাজা ভগবানেরই অংশ এই তথ্য 'মানব ধর্মশাস্ত্রেই' প্রথম পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই ভাবে রাজাকে ভগবানের অংশ বলা হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ব পড়লে তোমরা জানতে পারবে যে, রাজাকে ভগবানের অংশ বলে মনে করাটা সামন্ত যুগের একটা বিশেষত্ব। এথেকে মনে হয় যে, ভারতও তখন সামন্তযুগে প্রবেশ করেছিল।

মনুর ধর্মশাস্ত্র. ছাড়া বশিষ্ঠের ধর্মশাস্ত্র তখনকার আর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। তাতেও বলা হয়েছে যে, শূদ্রেরা শুধু অন্য তিন শ্রেণীর সেবা করবে। মড়ার মতই অপবিত্র হচ্ছেন শূদ্র। কাজেই তাঁদের কাছে যেন কেউ বেদমন্ত্র উচ্চারণ না করেন। কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ের

কাছে গেলে তাঁকে 'বিরণ' ঘাসে জড়িয়ে আগুণে পুড়িয়ে মারতে হবে। শুধু শূদ্র নয়, ক্ষত্রিয়রাও ঐ অপরাধ করলে তাঁদের শরীর ঘাসে জড়িয়ে পোড়াতে হবে এই ছিল সে শাস্ত্রের বিধান। কোন কোন ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ স্মৃতি অন্য সব স্মৃতির চেয়েও কঠিন। বিশেষ করে ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধে এত কড়া শাস্তি অন্য কোন শাস্ত্রে নেই। কেউ যদি ব্রাহ্মণের কোন কিছু চুরি করেন তাহলে তাঁকে মাথার চুল খাড়া করে রাজার কাছে দৌড়ে নিজের দোষ স্বীকার করতে হবে। রাজা তখন তাঁকে 'উডুম্বরা' কাঠের অস্ত্র দেবেন। সেই অস্ত্রে তিনি করবেন আত্মহত্যা। এখন একথা ভাবলেও গা শিউরে উঠে!

মনু ও বশিষ্ঠ ছাড়া আরও অনেক ধর্মশাস্ত্র ছিল তখন। তারমধ্যে যাজ্ঞবল্কের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক। তিনি এঁদের আগের লোক, তাই তাঁর গ্রন্থে শূদ্রদেরও আর্য বলা আছে। এবং তিনি তাঁদের অপবিত্র বলেন নি। এসব থেকে মনে হয় যে নানা যুগে বর্ণগুলির সামাজিক অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

বড়শিব বকাটক:যুগ

ব্রাহ্মণদের বিপ্লববিরোধিতার পরেই ভারতে নানা ছোট ছোট ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা নিজেদের ধর্মমত নিয়ে গোঁড়ামী করতেন। বেদের জায়গায়

দেখা দিয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা। তবে পূজার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও সকলে বেদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতেন।

এযুগের বিখ্যাত রাজা হচ্ছেন মধ্যভারতের "নাগ বড়শিব" রাজবংশ। তাঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলতেন। তবে তাঁরা সত্যি ক্ষত্রিয় বংশের কিনা সে বিষয়ে এখনো যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বৌদ্ধদের প্রভাব কাটাবার জন্য 'নাগ' রাজারা শিব উপাসনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা অনেককটি রাজ্য এক করে এক রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলেন। নিজেরা সেই রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্ব বাজায় রেখে তাঁরা বৌদ্ধ কুশানদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গোঁড়ামীই ছিল হিন্দুদের প্রধান অস্ত্র। ব্রাহ্মণরাই ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির বাহক বলে দাবী করেন। তাঁরা বৌদ্ধদের দমন করতে চেষ্টা করেছিলেন, আর বেদের অনুশাসন মেনে চলতেন। বৌদ্ধরা কিন্তু জাতি বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে নিজেদের মতবাদ প্রচার করতেন। তাঁরা ছিলেন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন। কাজেই বৌদ্ধরা চলে গেলেন বেদের অনুশাসনের বাইরে।

জাতি ধর্মের বাঁধন ছিল না বলেই বাইরের কুশান বংশও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শকরাও হয়েছিলেন বৌদ্ধ। বিদেশী বৌদ্ধরা কোন না কোন ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাদের উঁচু স্থান দেওয়া হ'ত না। স্মৃতিতে তাঁদের শূদ্র বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার জন্যে নাগরাজারা তাই প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণদের অনুশাসন মেনে চলতেন আর নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করেন। এথেকে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতের কোন জাতি সুযোগ বুঝলেই হাতে ক্ষমতা পেয়ে নিজেকে উঁচুজাতের বলে জাহির করতেন। তাতে কেউ আপত্তি করতেন না। জাতিটা ছিল মনগড়া!

আরও পরে বকাটক ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হয়েছিল (২৮৪ খ্রীঃ ৩৪৮—খ্রীঃ পর্যন্ত)। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিদ্যাশক্তি নামে একজন ব্রাহ্মণ। কিন্তু এঁর ছেলে নবক্ষত্রিয় বড়শিব বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা গুপ্তদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ভারতের অন্যতম প্রধান রাজবংশ বলে পরিগণিত হতেন। শিবপূজার দিকে এঁদের ঝোঁক ছিল বেশি।

ঐ সময়েই দক্ষিণ ভারতে পল্লব বংশের রাজারাও নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিলেন। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। অশ্বত্থামার বংশ সম্ভূত বলে গর্ব করতেন তাঁরা। কথিত আছে যে, অপ্সরা রজনীর সঙ্গে অশ্বত্থামার মিলনের ফলে এক সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তাকে নবপল্লবের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল বলে নাম হয় পল্লব। তাথেকেই ঐ বংশের নাম হয়েছে পল্লব রাজবংশ।

ভারতে এসময় সব জায়গাতেই ব্রাহ্মণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বকাটকদের পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজা উড্ডীন রাখবার দায়িত্ব এসে পড়েছিল গুপ্ত রাজবংশের উপর।

গুপ্তযুগ

হিন্দুধর্ম বলতে এখন যা বোঝায় তার গোড়া পত্তন হয়েছিল গুপ্তযুগে। এ নতুন ধর্ম বিধানকে 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' বলাই বোধহয় ভাল। সে সমাজ ব্যবস্থার মূলে ছিল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। তাতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কারও সন্দেহ প্রকাশ করবার অধিকার ছিল না। বেদকে অপৌরুষেয় দেববাক্য বলে মানা হ'ত। আচার ও অস্পৃশ্যতা এযুগেই আরম্ভ হয়েছিল।

আচার্য দত্তের মতে এভাবে সুসংগঠিত হয়ে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদে পরিণত হয়েছিল। আর ব্রাহ্মণ্যবাদই হল ভারতের 'জাতীয়তাবাদ'।

গুপ্তরা যদিও ব্রাহ্মণ্যবাদের পোষক ছিলেন কিন্তু তাঁদের উদ্ভব হয়েছিল নিচুবংশে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে 'লিচ্ছবী তনয়াসূত' বলে গর্ব করেছেন। লিচ্ছবীরা আগের যুগে ভারতীয় সমাজে ব্রাত্য বা অস্পৃশ্য ছিলেন। তাছাড়া মজার কথা হচ্ছে যে, তাঁরা কোথাও নিজেদের জাতের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ঐতিহাসিক জয়শোয়াল ৩৪০ খ্রীঃ "কৌমুদিনী মহোৎসব" নামে একটি নাটক থেকে আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁরা জাতিতে ছিলেন 'করস্কার'। বৌধায়ন করস্কারদের অত্যন্ত হীনবংশজাত বলেছেন। তাঁর বিধান হচ্ছে যে, করস্কারদের সঙ্গে দেখা হলে ব্রাহ্মণরা যেন বাড়ী ফিরে স্নান করে পবিত্র হন। মহাভারতে কর্ণপর্বেও

আছে যে, করস্কারদের কোন ধর্ম নেই। পণ্ডিত জয়শোয়ালের মতে আধুনিক যুগের কক্কর জাঠদেরই পূর্ব পুরুষ হচ্ছেন এই করস্কাররা।

যে বংশ থেকেই গুপ্তদের উৎপত্তি হক না কেন তাঁদের আমলেই আবার বৌদ্ধ ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে উঠেছিল। তখন অবশ্য খাঁটি বেদের আচার বিচার আর চলত না। সবাই নিজে নিজে এক এক দেবতার আরাধনা করতেন। গুপ্তরা করতেন বিষ্ণুর আরাধনা। তখন হিন্দুধর্ম চলত স্মৃতির অনুশাসনে। বর্ণ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা আর তাঁদের সম্মান দেখানোই ছিল তখনকার ধর্মের প্রধান অঙ্গ। পুরাণের বীরদেরও লোকে তখন দেবতা বলে পূজা আরম্ভ করেছিলেন। বেদের আচারের কথা এখন থেকে আর শোনা যায় না। তার বদলে তন্ত্র ও পুরাণের বিধান মানতে হ'ত সবাইকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ছিলেন এ যুগের প্রধান দেবতা।

বিষ্ণু, নারদ ও পরাশর লিখিত স্মৃতি এযুগের প্রধান ধর্ম গ্রন্থ। বিষ্ণু স্মৃতিতে ম্লেচ্ছের সঙ্গে কথা বলাও নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্য জাতের কেউ যদি উচ্চ শ্রেণীর কাউকে ছুঁয়ে দেয় তো তাকে হত্যা করা উচিৎ—এমনি সব কথা আছে তাতে।

পরাশর স্মৃতিতেও যথারীতি ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা আছে। তাহলেও এর অনেক বিধান আছে উদার। এই

সময়ে ভারতে গোমাংস খাওয়া পাপ বলে গণ্য হত। পরাশর সেজন্য কেউ গোমাংস খেলে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। তবে মনুর মত তিনি শূদ্রদের তত কঠোর বিধান দেননি। পরাশরের আর একটি বিধান হচ্ছে বিধবাদের পুনর্বিবাহ। কখনো কখনো উদারতা দেখালেও তিনি কিন্তু সত্যিকার মনে প্রাণে উদার ছিলেন না। তাই তিনি সতীদাহ প্রথা সমর্থন করেছেন। নারদ স্মৃতিতেও পরাশরের মত বিধবাদের পুনর্বিবাহের উল্লেখ আছে।

এযুগের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকদের কোন ধর্মের উৎসবে যোগ দিতে দেওয়া হ'ত না। তাঁরা মন্ত্র ও গায়ত্রী জপের অধিকারী ছিলেন না। শূদ্র ও স্ত্রীলোকদের তখন একই পর্যায় ফেলা হত।

এছাড়া বৌদ্ধদের অনেক রীতিনীতিও তখন হিন্দুরা গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধদের দেখাদেখি হিন্দুরা বৈষ্ণব ধর্মের অহিংসা মত প্রচার করেন ও শূদ্রদের সম্পর্কে উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

আচার্য দত্ত বলেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ফলে বেদের আচার নিয়ম ঠিক যথাযথ ভাবে তখন অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। সেজন্যে হিন্দুরা উপনিষদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন থেকেই বেদান্ত দর্শনের প্রচার হতে থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দেবারও চেষ্টা হয়েছিল তখন। দার্শনিকরা বলেন যে, প্রথমে জগতের সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে গুণ ও

কর্ম অনুসারে সমাজে চারভাগ হয়েছে। সমাজে এবার পরস্পর বিরোধী দুটো ভাব দেখা দিয়েছিল। একদিকে পুরোহিতদের গোঁড়ামী যত বাড়ছিল আর একদিকে দার্শনিকদের দল ততই উদার নীতির প্রচার করেছিলেন।

বৈদিক যুগেই আর্য সমাজ পশু পালনের স্তর পেরিয়ে এসেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তখনই। পরের যুগে দেশে ব্যবসায়ী-সংঘও গড়ে উঠেছিল। নিজেদের শ্রেণী ছাড়া বাইরে বিয়ে করা বারণ হয়েছিল। আরও পরে আমরা দেখি বংশের শ্রেষ্ঠতা, সমাজের উঁচু-নিচু শ্রেণীর ভেতর শাস্তির পার্থক্য। বৌদ্ধ জাতকে আছে যে, চাষীরা জমিদারের জমীতে এমনি খেটে দিতেন। সে ব্যবস্থাকে এক ধরনের "ভূদাস" প্রথা বলা যেতে পারে। জমিদারী প্রথাও বেশ প্রচলিত ছিল তখন। রাজার দেবতার অংশে জন্মের ধারণা, বংশপরম্পরায় রাজা হবার নিয়ম, বড় রাজার অধীনে নানা সামন্ত রাজা নিয়োগের কথা, ও সমাজের শ্রেণী বিভাগ বেড়ে যাওয়াই হল সামন্তবাদের প্রধান পরিচয়! জমিদাররা তখন অনেক আইনের গণ্ডীর বাইরে ছিলেন ও তাঁদের শিকারের নানা আইন কানুনও ছিল। সমাজের এসব বিশেষত্ব থেকেই মনে করা হয় যে, ভারতে তখন সামন্তবাদ প্রচলিত হয়েছিল। সামন্ত যুগের আর এক বিশেষত্ব হচ্ছে 'ধর্মরাজ্য'। ভারতেও ধর্মরাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় বহু স্থানেই।

উত্তর ভারতে যখন এতসব সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছিল তখন সমুদ্র গুপ্ত দক্ষিণ ভারত জয় করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের মত তিনি দক্ষিণ ভারতের সব রাজাকে উচ্ছেদ করতে পারেন নি। সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বেই প্রথম "ভারতবর্ষ" নাম শোনা যায়। আগের মত আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথ না বলে এখন শুধু ভারতবর্ষ বলে সমগ্র ভারতকে বোঝানো হত। এভাবে ভারতের সংস্কৃতিগত ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। বৈদিক যুগ থেকেই দক্ষিণাপথে আর্য সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল।

অশোকের মৃত্যুর পরেই শতবাহনবংশ গোদাবরীর উপত্যকায় ব্রাহ্মণ রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। তারপরে বকাটক ও সমুদ্র গুপ্তের আক্রমণে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের অধীন হয়ে পড়েছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন ক্রমান্বয়ে বড়শিব বকাটক ও পল্লবদের ব্রাহ্মণ রাজত্ব চলতে থাকে।

দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা এমনি করে এক অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হন ও তাঁদের সঙ্গে থাকে রাজবংশের সম্বন্ধ। দাক্ষিণাত্যে আয়ার ও আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণরা সেজন্যে এখনো সমাজের অভিজাত শ্রেণী বলেই পরিচিত।

পশ্চিম ভারতের শক রাজারা তাঁদের নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে থাকেন। এমনকি শকদের নেতা রুদ্রদমন নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন শতবাহন রাজবংশের ছেলের সঙ্গে। ব্রাহ্মণদের আচার অনুসরণ করলেও শক রাজারা ছিলেন বিদেশী। গুপ্ত সম্রাটরা এই সব বিদেশী

রাজবংশের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৩৮ খৃঃ তৃতীয় রুদ্রসিংহকে হত্যা করে শক বংশ ধ্বংস করেছিলেন।

শক বংশের একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তাঁদের অধীনে ব্রাহ্মণদের কোষাগার ও অন্য রাজকার্যেও নিয়োগ করা হ'ত। শক বংশের রাজত্ব কালে "পরমভাগবত" হেলিওডোরাস এক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এসব নানা ঘটনা থেকে মনে হয় যে, তখন যে সব বিদেশী বাইরে থেকে ভারতে আসতেন তাঁরা এদেশের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের এমন ভাবে খাপ খাইয়ে নিতেন যে, তাঁদের আর বিশেষ কোনও সত্ত্বা থাকত না। তাঁদের কেউ কেউ হিন্দু নাম ধাম নিলেও কিন্তু সব সময় ব্রাহ্মণদের রাগের হাত থেকে রেহাই পেতেন না।

বর্দ্ধনযুগ

থানেশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬-৬৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন। বৈশ্য পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর রাজত্বের শেষে আবার বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এতদিনে বৈশ্যরা কৃষি ছেড়ে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন! ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্যবসায়ী সংঘ গুলোও দখল করেছিলেন। তখন চাষবাস্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু শূদ্রদের কাজ। শারীরিক কাজ করা ক্রমেই অবজ্ঞার জিনিস হয়ে উঠেছিল।

বর্ধন যুগ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। হর্ষের পরে তাঁর নাতি চতুর্থ ধারাসেন সম্রাট হন। জাতিতে তিনি ক্ষত্রিয় হলেও বৌদ্ধধর্ম খুব ভালবাসতেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা সারা উত্তরভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সে সব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ মূর্তি ও মন্দির তৈরী করেন। ক্ষণস্থায়ী হলেও এযুগে উত্তর ভারতে নতুন করে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল। কাজেই এর পরে আবার প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সংঘর্ষ বাধতে থাকে।

বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ

বর্ধন যুগের পর ভারতের সমাজে নানা জাতির উদ্ভব হয়। বাংলায় ছিল পালবংশ, রাজপুতানায় গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকুট।

'মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে' আছে যে, ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় অরাজকতা দেখা দেয়। গুপ্ত রাজবংশের পরে বাংলার জনসাধারণ 'ভদ্র' নামে একজন শূদ্রকে রাজা নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি রাজা হয়ে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কমিয়ে দেন। তারপরে আবার গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচিত করা হয়েছিল। তিনিও ছিলেন হীনশ্রেণীর। বাংলার লোক তখন ব্রাহ্মণদের অত্যাচার অনাচারে উত্যক্ত হয়েই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। তিনিই বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বহুদিন ধরে বাংলা ও

মগধে এই পাল বংশ রাজত্ব করেছিল। শুধু বাংলা কেন, ভারতের ইতিহাসেই পাল বংশের তুলনা মেলা ভার। অন্য সব রাজবংশের চেয়ে এঁরা বেশিদিন রাজত্ব করেছিলেন। পাল-রাজত্বে আবার বৌদ্ধধর্ম পূর্বভারতে খুব দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল। এ রাজত্বে অবশেষে গরীব জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

জনসাধারণের মধ্য থেকেই এসেছিলেন বলে পাল রাজারা ছিলেন সকলের প্রিয়। পাল রাজাদের কাহিনী নিয়ে কত গাথা যে বাংলা দেশে প্রচারিত আছে তার ইয়ত্তা নেই।

পালবংশের সময় তাঁদের রাজত্বের পশ্চিম সীমান্ত ছিল জলন্ধর, পূর্বে কামরূপ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত। এখনকার যুগে যাঁদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে তাঁরাই ছিলেন সে যুগের এতবড় পাল সাম্রাজ্যের শাসনের অংশীদার। তাঁদের ভেতর থেকেই নিযুক্ত হতেন রাজকর্মচারী। বর্দ্ধমানের ঘনরাম চক্রবর্তীর লেখা "ধর্মমঙ্গল" কবিতায় আমরা সে যুগের সমাজের বর্ণনা পাই।

আরও পরে একাদশ শতাব্দীতে বাংলার ইতিহাসে আরও একটি শূদ্র বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল-বংশের দ্বিতীয় মহীপাল অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন বলে উত্তর বঙ্গের জনসাধারণ কৈবর্ত দিব্যোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই বিদ্রোহ সফল হওয়ায় সমস্ত উত্তর বঙ্গ তাঁর অধীন হয়েছিল। মহীপালের ছেলে রামপালের আমলে অবশ্য সে

বিদ্রোহ আবার দমন করা হয়েছিল। এ বিদ্রোহের ভেতরও আমরা নতুন বাংলার শূদ্র সংগঠনের শক্তির আভাস পাই।

বাংলার পালবংশের মত রাজপুতনার গুর্জর-প্রতিহাররাও তখনকার ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। প্রায় সমস্ত পশ্চিম ভারতেই তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রতিহারদের প্রতিপত্তিই ছিল বেশি। তাঁরা যে বংশেই জন্মে থাকুন না কেন রাজত্ব দখল করেই নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করেছিলেন। সেজন্যে আজও তাঁরা ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত। আর একই বংশের হয়েও রাজ্যহীন গুর্জররা এখনও শূদ্র বলেই পরিগণিত হচ্ছেন ভারতীয় সমাজে। শ্রেণী সংঘর্ষের মজাই হচ্ছে যে, যে শ্রেণী জোর করে রাজ্য দখল করে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন, তাঁরাই সমাজের অন্যের কাছ থেকে সম্মান আদায় করবেন। অন্যেরা পড়ে থাকবেন পেছনে।

ঐ সময়েই দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদের তাড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকূট বংশ সিংহাসন দখল করেছিলেন। এঁরাও ক্ষত্রিয় বংশেরই লোক। কাজেই এতদিন পরে আবার ক্ষত্রিয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি যে তখন কিছু কমেছিল তা বলা যায় না।

বাংলার পাল রাজবংশের রাজারা রাষ্ট্রকূটের বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। আরও পরে বাংলার বল্লাল সেনের বিয়ে

হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজকন্যার সঙ্গে। কিন্তু আমরা জানি যে, পাল রাজারা জাতিতে ছিলেন শূদ্র আর সেন রাজারা ব্রাহ্মণ! তাহলেই দেখতে পাচ্ছে যে, তখনকার দিনে ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও বিয়ে হ'ত।

মুসলমান আক্রমণ

ভারতের সামাজিক ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে রাজপুতদের আবির্ভাব এক নতুন যুগের সূচনা করে। বাংলার পাল, গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের অন্তর্ধানের পর নানা বংশের রাজা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে ভারতের বুকে রাজত্ব করেছিলেন।

রাজপুতানায় তখন সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ও রাজপুত-দের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ থাকাতে তাঁরা কখনোই ঐক্য বদ্ধ হতে পারেননি। সেই সময়ে মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পতন হতে থাকে।

৭১২ খ্রীঃ সিন্ধু প্রদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয়েছিল। তখনকার বিদেশী মুসলমান সাহিত্যিকদের লেখা থেকে ভারতের সামাজিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ৯০০ খ্রীঃ খোরদাদবে লিখেছেন যে, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেন না। তবে তাঁরা ক্ষত্রিয়দের মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। শূদ্ররা তখন চাষবাস করতেন। এথেকে প্রমাণ হচ্ছে বর্ধন-যুগের শেষে শূদ্রদেরই সত্যি সত্যি কৃষিকাজ করতে হ'ত। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মামুদের সঙ্গে আলবেরুণী এসে

লিখে গেছেন যে, রাজপুতদের প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদের চেয়ে বেশি ছিল, কম নয়।

পশ্চিম ভারতে যখন মুসলমান আক্রমণ হচ্ছিল তখন বাংলায় আবার এক নতুন পরিবর্তন ঘটছিল। পালযুগের শেষে নানা সামন্ত নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাঢ় 'সুরা' সম্প্রদায় দর্দিস্থান থেকে এসে বাংলায় ক্ষত্রিয় রাজা-রূপে দেশ শাসন করতেন! "মানব ধর্মশাস্ত্রে" এঁদের অস্পৃশ্য বলায় এঁরা প্রকৃত পক্ষে হিন্দু সমাজের বাইরে ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, বাংলায় ব্রাহ্মণরা এঁদেরই ক্ষত্রিয় বলে গোঁড়া সমাজে পাংতেয় করে নিয়েছিলেন! ব্রাহ্মণরা যে নিজেদের সুবিধা মত যাকে যে জাতিতে ইচ্ছা তুলে নিতেন এটা তারই এক উদাহরণ।

তারপর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বর্মন বংশ এসে পূর্ববঙ্গে এক ব্রাহ্মণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশেষে দক্ষিণ থেকে সেন বংশ এসে পালদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁরা রাজা হয়েই নতুন করে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছিলেন।

জনসাধারণ তখন ভয় পেয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করতে থাকেন। সেনরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুযায়ী বাংলার সমাজকে ভেঙে-চূড়ে নতুন করে গড়তে চাইলেন। এম্নি অত্যাচারের চাপে পড়ে অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলা থেকে উচ্ছেদ পাবার উপক্রম হয়। তখন প্রকাশ্যে

আর কেউ নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতে সাহস পেতেন না। কিন্তু গোপনে বৌদ্ধধর্মের চর্চা চলতো তখনো। যাঁরা আগে বৌদ্ধ ছিলেন তাঁরা এবার তান্ত্রিক বলে নিজেদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশির ভাগ বৌদ্ধই সে সময় চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরাও সেই সুযোগে প্রচার করেন বৌদ্ধ ধর্মই লুপ্ত হয়ে গেছে বাংলা থেকে।

এ সময় বাংলাদেশে এক প্রবাদ শোনা যায় যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া অন্য কোন জাতিই থাকবে না। ফলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভীষণ ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা সবাই হলেন হীন,—শূদ্র। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রঘুনন্দন শর্মাও একথাই বলতেন।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, বাংলাদেশে তখন যে সব লোক মুসলমান বা ব্রাহ্মণদের দলে যোগ দেননি তাঁদের সবাইকেই অস্পৃশ্য করে দেওয়া হয়েছিল। এমনি করে প্রায় অর্ধেক হিন্দুকেই হিন্দু সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

নতুন সমাজ ব্যবস্থায় 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' বলে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁরা অস্পৃশ্যদের ব্রাহ্মণ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণরা এঁদের অস্পৃশ্য করে রেখেছেন। অস্পৃশ্যদের মধ্যে পৌরহিত্য করেছিলেন বলেই তাঁদের এই অবনতি ঘটেছিল। এথেকে প্রমাণ হয় ব্রাহ্মণদের সম্মান নির্ভর করে

তাঁদের যজমানের উপর। তখন বাংলায় যত ভিন্ন ভিন্ন অস্পৃশ্য জাতি ছিল ঠিক ততগুলি শ্রেণীর "বর্ণ ব্রাহ্মণের" নাম পাওয়া যায়।

বাংলার নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে চৈতন্য দেবের সময়ে সেন বংশ থেকে। কাজেই এখানে প্রাচীন বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা নজরে পড়ে না।

এতদিন পর্যন্ত ভারতে যে জাতিই এসেছে সে-ই হিন্দু-সমাজব্যবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে শেষে ভারতেরই লোক হয়ে গেছিল। কিন্তু মুসলমানদেব সময় প্রথম এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। ইসলামের সঙ্গে শুধু বিদেশী ধর্ম ই এল না—হিন্দুদেরই মত জোড়ালো এক সংস্কৃতি রইলো তার পেছনে। কাজেই কেউ মুসলমান হলে তার সমস্তই জীবন বদলে ফেলতে হ'ত। তা ছাড়া ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী কোনও রকমেই হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। ইসলামের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তখন হিন্দুরা রক্তের সম্পর্কের উপর জোব দিযে জাতি বাঁচাতে চাইল। তখনই বিধান দেওয়া হয় যে, ইসলামের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করা চলবে না। ফলে মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত করা হল। তাঁদের সঙ্গে উঠা, বসা, কথা বলা—সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য নিয়ে যতই মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ হচ্ছিল ততই হিন্দুদের মধ্যে এই মনোভাব বেশি ছড়িয়ে পড়ছিল। তাঁরা তখন

মুসলমান-সংস্পর্শ থেকে বাঁচবার জন্য যত রকমের সম্ভব বিধি-নিষেধের গণ্ডী তৈরী করে নিলেন সমাজের চারিদিকে। সেই বিধি নিষেধের ফলেই আজকের হিন্দু সমাজ এই আকার নিয়েছে।

জাতের দিক থেকে যেমন নানা গণ্ডী তৈরী হয়েছিল তেমনি একদেশ থেকে আর এক দেশের লোকের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কও ক্রমে ক্রমে উঠে গেল। তারফলে কোন দেশের লোক একই জাত হলেও অন্য জায়গার লোকের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক করত না। রাঢ় দেশের কায়স্থ বরেন্দ্র অঞ্চলের কায়স্থ সমাজে বিয়ে করতেন না।

আগে 'বর্ণ' বলতে যা বোঝাতো বাংলাতে সে 'বর্ণের' কোনই অস্তিত্ব ছিল না। তার জায়গা নিয়েছিল ছোট ছোট জাত। প্রত্যেক জায়গার লোক অন্যকে সন্দেহ করতেন যে, হয়তো তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। কাজেই এত বাছবিচার।

সংস্কারের আন্দোলন

এত করেও কিন্তু কিছু হয়নি। যে সব বৌদ্ধরা এতদিন ব্রাহ্মণদের ভয়ে মাথা তুলতে পারেন নি তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে ভিড়তে লাগলেন। মুসলমান সমাজে জাতিভেদ নেই আর বৌদ্ধধর্মেও তাই বলে। মুসলমানরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না—আর বৌদ্ধরা নাস্তিক। এ সব নানা

কারণে তাঁরা ব্রাহ্মণ্যসমাজের চেয়ে মুসলমান সমাজে যোগ দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। বৌদ্ধরা দলে দলে মুসলমান হয়েছিলেন বলেই পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। কারণ ঐ সব অঞ্চলে ছিল বৌদ্ধদের প্রাধান্য।

ভারতে মুসলমান আমলে যখন একদিকে লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করছিল আর অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বিধান আরও কড়া হচ্ছিল তখন বহু সংস্কারকের উদয় হয়েছিল। তাঁরা হিন্দুদের কড়া শাসনকে একটু নরম করতে চাচ্ছিলেন।

সংস্কার আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে। সেদেশে বহু সংস্কারক জন্মেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মও প্রথমে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত হয়েছিল। সেই আন্দোলন থেকে কবীর ও নানক প্রেরণা নিয়ে উত্তর ভারতে নতুন ধর্ম প্রচার করেন। বাংলায় চৈতন্যদেবও প্রেমের ধর্ম প্রচার করেন সেই সময়। ষোড়শ শতাব্দীতে সারা উত্তর ভারতেই বৈষ্ণব আন্দোলন চলতে থাকে। এ মতের বিশেষত্ব ছিল আত্মায় বিশ্বাস, জাতিভেদ অস্বীকার করা, এবং প্রেম। এর সবকটি কথাই জনসাধারণের ভাল লাগায় তাঁরা দলে দলে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম আলোচনা করলে এতে বৌদ্ধ ও ইস্‌লাম দুই ধর্মেরই কিছু কিছু ভাব লক্ষ্য করা যায়।

বৈষ্ণব সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল জাতিভেদ তুলে দেবার জন্যে। কিন্তু কালক্রমে বৈষ্ণবরাও নিজেদের মধ্যে নানা জাত গড়ে তুলেছিলেন। এমন কি অনেক জায়গায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরও দরকার হত।

এসব থেকে বোঝা যায় মনুর 'ধর্ম' শাস্ত্র'ই ছিল তখনো বাংলার হিন্দু সমাজের আদর্শ। কাজেই সমাজে কোন জাত যদি সম্মান পেতে চাইতেন তাহলে তাঁকে মনুর আদর্শ অনুসরণ করতে হ'ত। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রভুত্বও মানতে হত তাঁদের।

সেজন্যই আজকের যুগের বাংলায় যে সব জাত সৃষ্টি হয়েছে তাদের এত শত সহস্র বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। বিয়ে ও সামাজিক লেন-দেনও নিজেদের মধ্যেই করতে হয়।

সামন্তবাদ

ইতিহাস আলোচনা করে দেখা গেছে এদেশে রাজা থেকে আরম্ভ করে সত্যিকারের চাষীর মধ্যে অনেক কয়টি স্তর আছে।

বেদের যুগে অনেক রাজা প্রার্থীদের জমি দান করতেন এ সব জমি দান পেয়ে স্বভাবতই একদল জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল দেশে। তাঁদেরই হয়তো 'মঘবা' বলা হ'ত। পরের মৌর্য যুগে শূদ্র রাজত্বে আর এঁদের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায় না। আরও বহু পরে বড়শিব-বকাটক যুগে নতুন করে এ ধরনের জমিদারদের নাম অনেক পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে বুদ্ধগুপ্তের রাজত্ব কালে যমুনা ও নর্মদা নদীর মধ্যে সামন্ত নৃপতি মহারাজা সুরস্মিচন্দ্রের রাজত্ব ছিল। আরও নানা শিলালিপি থেকেও একথা জানা যায় যে রাজ চক্রবর্তীর অধীনে তখন ভারতে অনেক সামন্ত রাজা থাকতেন। তাঁরা সময় সময় রাজার অধীনে হয়তো চাকুরীও করতেন।

রাজার দান পেয়ে সামন্তরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেন সব সময়। দরকার হলে তাঁর জন্য সামন্তরা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। পাল ও সেন রাজাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে নিমদীঘিঘাটের যুদ্ধে এমনি করে 'গোপরাজা' প্রাণ

দিয়েছিলেন। এমনি করে প্রাণ দেবার কথা মহাভারতের শান্তি পর্বেও ভীষ্মদেব বলেছেন। সে যুগের সামন্তদের নাম আর পদবী শুনবে ?

প্রথমে মহারাজাধিরাজ—স্বাধীনরাজা বা সম্রাট। তারপরে যথাক্রমে মহাসামন্তাধিপতি বা মহাসামন্ত কিংবা মহা-মণ্ডলিকসামন্ত—মণ্ডলিক—মণ্ডলপতি, মণ্ডলেশ্বর বা মণ্ডলা-ধিপতি (রাজ্যের একটি অংশের উপর যাঁদের কতৃত্ব থাকে) ভুক্তিপতি, ভোগপতি, ভোগিক, মহাভোগপতি, মহাভোগিক (এখনকার 'বিভাগের' মত জায়গার কর্তা), গ্রামপতি (গ্রামের কর্তা), ষষ্ঠাধিকৃত (যিনি রাজস্বের ছয়ভাগের একভাগ পেতেন), ভোজক (বোধহয় যিনি কোনোও রাজস্ব না দিয়ে জমি ভোগ করেন), কুটম্বী—ক্ষেত্রকার কর্ষক, ক্ষেত্রপ (যে চাষীর নিজের জমি আছে), বর্গাদার (জমির প্রকৃত মালিকের সঙ্গে কোন চুক্তি করে তাই নিয়ে যে চাষী কাজ করেন), আর জমিহীন চাষী।

সামন্ত যুগে রাজা অনেক জমি বা রাজ্য এমনিতেই সামন্তদের দান করতেন। কারও কোনও কাজে হয়তো রাজা খুব খুশি হলেন। অমনি তিনি তাঁকে কোনও জমি-জমা দান করে রাজা বা সামন্ত করে দিতেন। এমনি সামন্ত করবার বহু উদাহরণ আছে এদেশে। এভাবে দান করাকে হিন্দু আমলে বলতো "নীবি ধর্ম" বা "অক্ষয় নীবি।" মুসলমান আমলে এ প্রথাকে বলা হত—"জায়গীর।"

অনেক সময় কোন জমিজমা দান না করে রাজা কাউকে খাজনা মাফ করে দিতেন। সামন্তযুগের এও একটা বিশেষত্ব।

"চাকরান" ব্যবস্থা হ'ল সামন্তবাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ইওরোপে সামন্ত রাজারা যে জায়গায় থাকতেন সে জায়গায় তাঁরা ছিলেন একছত্র অধিপতি। তাঁদের অধীনে অনেক ধরনের লোক থাকতেন। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক ছিল আলাদা।

সামন্ত প্রভু তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন বটে, তবে কাজের কোন নগদ দাম দিতেন না। জমি দান করতেন কাজের বদলে। যাঁরা তাঁর দেওয়া জমি ভোগ করতেন তাঁরা এই রকম বেগার খেটে দিতে বাধ্য থাকতেন।

ভারতেও দেখা যায় সামন্ত প্রভুদের অধীনে সেকরা কামার, ছুতোর, কুমোর, নাপিত, পুরোহিত, চাকর শ্রেণীর লোক সবাই থাকতেন। কাজের জন্য চাকরান জমি দান করবার রেওয়াজ ছিল সে সময়।

ভালকরে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে ভারতে সামন্ত যুগের সব কটি বিশেষত্বই প্রকাশ পেয়েছিল। সামন্ত যুগ পেরিয়ে ইওরোপ যখন ধনতান্ত্রিক যুগে পা দিয়েছিল তখনো ভারতে চলছিল সামন্ত যুগ।

বৃটিশ শাসনের ফলে শাপে বর হবার মতই ভারতবর্ষও

ক্রমে ক্রমে সামন্ত যুগের মোহ কাটিয়ে উঠ্ছে। যতই এদেশে যন্ত্রের প্রসার হবে ততই সামন্ত যুগের চিন্তাধারা ও জীবন যাপন প্রণালী বদলে গিয়ে আমরা পৃথিবীর অন্য প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো।

শেষ